প্রকাশক :

ডাঃ নিখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

নব-নিকেতন

৩১বি, ক্রেটবিশন রোড,

কলকাতা-২৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রক :

হরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,

কলকাতা-৬

১০১, বৈঠকখানা রোড,

কলকাতা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের

বীর শহীদদের উদ্দেশে—

ভূমিকা

পূর্ববাংলার পূর্বাঞ্চলে তিমিরান্তক অরুণোদয় কিংশুকরাঙানো আলোক বন্যায় দিগন্তপ্লাবী। পূর্ববাংলার পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রস্বপ্নের বেগার্ত তরঙ্গভঙ্গে মেঘবর্ণ। স্মরণাতীত কাল থেকে মুক্ত প্রকৃতির বুকে লালিত পালিত পূর্বাঞ্চলের বলিষ্ঠসুন্দর তরুণ-তরুণীর কিশোর-কিশোরীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেহমন সাহসিক বীর্যের ও স্নেহ-প্রেম-প্রীতি করুণার সারল্যে সুগঠিত। বিশাল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল কাব্যধারাও বহুলাংশে সংস্কৃতপ্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলাভাষায় রচিত ও তার ভাবকল্পনা নদীমাতৃক পলিমাটির স্নিগ্ধ শস্যসৌরভে প্রাণবন্ত। সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতে "বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা বারা সংস্কৃতপূর্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল।" পরবর্তীকালে "বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত একটা মুখোশ পরাইয়া দিয়াছে। বঙ্গপল্লীর দোয়েল ময়ূর সাজিয়া বাহির হইয়াছেন!" এই অভিমতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছেন, "তখন সিন্ধবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের মত বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ চাপিয়া বসে নাই। এই সকল কাহিনীকাব্যের (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা প্রভৃতি) নায়ক-নায়িকা বেনে, সদগোপ, বৈশ্য, ব্যাধ, এমন কি ডোম জাতীয়। যে সকল গান ও ছড়া দেবমণ্ডপে বহুশতাব্দী পূর্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন কিন্তু কাজে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া লইলেন।" অনুরূপভাবে পূর্ববাংলার সরলপ্রাণ মুসলমান কবিদের ওপরেও গোঁড়া অবাঙালী মোল্লা-মৌলবীরা সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ চাপাতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তথাপি তাঁদের কাব্যকাহিনীগুলির মধ্যে হিন্দু পুরাণের প্রতীক ও প্রতিমার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উদারচরিত সুফী ও দরবেশরা হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে কিছুটা সমন্বয় সাধন করতে

সক্ষম হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আউল-বাউল-দরবেশ-ফকীরদের সর্বধর্মে সমদর্শী মনোভাবের প্রেরণায় পূর্ববাংলার কৃষক কবিরা সম্পূর্ণ এক ধরণের নতুন স্বাদের কাব্যকাহিনী সৃষ্টির দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে একথাও সত্য যে সংস্কৃতপূর্ব যুগের লোকতান্ত্রিক কাব্যধারার দেশজ সরলতা সংস্কৃত যুগারম্ভের প্রভাবে কিছুটা শুচিতা হারায়। পল্লীপ্রাণের সহজ-সরল ধ্যান-ধারণা ও সহৃদয়হৃদয়সঞ্চারী ভাষার মধ্যে ক্রমশ দেখা দেয় ব্রাহ্মণ্য হেতুশাস্ত্রের দৌরাত্ম্য ও তৎসম-তদ্ভব শব্দাডম্বর। অন্যদিকে ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে পাঠান ও মোগল যুগপ্রভাবে বাংলাভাষার মধ্যে আরবী, ফারসি ও উর্দু শব্দাবলীর আধিক্য বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতপূর্ব যুগে রচিত কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে একটি কাহিনীর প্রেমমাধুর্যমণ্ডিত কয়েকটি পংক্তি, কয়েকটি সংলাপ অবিস্মরণীয়। 'মহুয়া' কাব্যকাহিনীর নায়ক নদ্যার ঠাকুর জলের ঘাটে নায়িকা মহুয়াকে অনেক রসালমধির বাক্যবিনিময়ের পর যখন বলে :

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মতো নারী পাইলে করি আমি বিয়া॥

কপট ক্রোধের ভ্রুকুটির সঙ্গে মহুয়া জবাব দেয় :

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুবা্যা মর॥

নায়কের কবিমন সুচতুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে করুণ সুর মিশিয়ে বলে :

কোথায় পাব কলসী কইন্যা. কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুবা্যা মরি।

পৃথিবীর কোন্ দেশের কবি কবে এমন গভীর-সরল ভাষায় এই ধরণের উত্তর দিতে পেরেছেন? প্রগাঢ় প্রেমের সংহত উপলব্ধি এখানে এই 'গহীন' কথাটির মধ্যে সূচিত হচ্ছে। প্রেমের এই পরমাশ্চর্য গভীরতার সঙ্গে বৈষ্ণব মহাজনের লেখা দুটি পংক্তি তুলনীয় :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

এ কবিতার অধ্যাত্মমদির রসাস্বাদনে তৃপ্ত মন তবু বলে, "তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুবা্যা মরি"—পংক্তিটির রসসম্পদ যেন আরো অন্তরঙ্গ আরো নিবিড়। মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার সৃষ্টি হয়েছিল কাব্যপ্রেমিক পূর্ববাংলার সেই যুগে, যখন "কাজল বরণ ভ্রমর"—"রূপার বরণ আঁখি" মেলে নীলাভ

ধর্মীয় মানবপ্রেমের আকাশ দেখতো, নিশীথ নক্ষত্রপুঞ্জের রূপালী প্রতিবিম্ব বিরহবিজন কাজলদীঘির বুকে সৃষ্টি করতো মায়াময় রূপকথার স্বপ্নময়তা। এই অপরূপ কাহিনীগুলি কাব্যশরীর পেয়েছিল হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালী কবিদের দ্বৈত সারস্বতসাধনায়। বৃহৎ বঙ্গীয় সমাজে সর্বযুগের কবিরাই ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমের পূজারী। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সংসারেই সম মর্যাদায় অর্চিত হন। এই দুই দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে পাঁচালিগান রচনা করেছেন দুই সম্প্রদায়ের লোককবিরা। কবিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাস্বর সেতু।

কবিতা মন গড়ে, কবিতা সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে, কবিতা বিদ্রোহ বিবর্তন বিপ্লবের নিয়ন্তৃশক্তি। আড়াই হাজার বছর আগের দার্শনিক প্লেটোর জ্ঞানগর্ভ কাব্যবিদ্বেষ ও তাঁর উন্নাসিক অনুগামীদের কাব্যবিমুখিতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই নিয়ন্তৃশক্তি আপন সত্তার বহুমুখী উন্মেষশিখা পৃথিবীর বুকে শত শতাব্দী অনির্বাণ রেখেছে। চারণ কবিদের দেশাত্মবোধক কাব্যগাথার প্রেরণায় সর্বপ্রকার অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ লোকশক্তি পুরোনো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজের যে সৌধ (Structure) নির্মাণ করে, সেই সৌধের বহুধাবিন্যস্ত ভাবকল্পনার ধারক ও বাহক নবীন কবিদের সাধনায় নব নব কবিতার উন্মেষ হয়। সমাজসচেতন নন্দনতাত্ত্বিকরা যাকে সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবসৌধ (Superstructure) বলেন। লেখকদের সম্বন্ধে স্তালিন বলতেন, "Writers are the engineers of human soul," আমার নিজের মতে "Poets are the makers of civilization" কবিরাই মানবসভ্যতার স্থপতি, যেহেতু লেখকদের মধ্যে কবিদের স্থান সর্বোচ্চে। একজন মানুষই হোক, আর দেশশুদ্ধ মানুষই হোক, যখন ক্রোধে ক্ষোভে নৈরাশ্যে বিষাদে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন দিশারী কবিরাই তাদের মনে নতুন করে আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম সাহসিকতা জাগিয়ে দেন, প্লেটোরা নয়। খণ্ডযুদ্ধ, মহাযুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসে নিরপরাধ আক্রান্ত পক্ষের মনোবল যখনই ভেঙে পড়ে, তখনই দেখা যায় চারণকবিদের বীর-রসাত্মক কাব্যগাথার প্রেরণায় আবার তারা প্রতিরোধের সংগ্রামে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব যুগেই কবিতা নির্জীব মনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে সজীব করে তোলে। বিপ্লবের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে "Tendentious

poetry"-র মূল্য অপরিসীম। একমাত্র প্রচারধর্মী কবিতাই লোকচরিত্র গঠনের সহায়তা করে। পূর্ববাংলার নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ আজ পাকিস্তানের বর্বর ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ করে লড়ছে। তাদের মনে উদ্দীপনা জাগাবার উদ্দেশ্যে এপার-বাংলা ওপার-বাংলার প্রবীণ ও নবীন কবিরা আজ তাই চারণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রচারধর্মী কবিতার নামে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করতেন তাঁরাও আজ প্রচারগাথা রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। এর ফলে আধুনিক প্রগতিশীল কাব্যধারা সমৃদ্ধ হবে। "রক্ততিলক" সংকলন গ্রন্থে নবযুগচারণদের কবিতাবলী স্থান পেয়েছে। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কবিরাই এ ধরণের সংকলন প্রকাশের পথপ্রদর্শক। স্বপ্নবিলাসী আত্মকেন্দ্রিক কবিরাও সমাজকেন্দ্রিক হতে বাধ্য হন ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নিদেশে। এর ফলে দেশ জাগে, জাতি জাগে। "রক্ততিলক" বইখানির অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের মুক্তিরণাঙ্গণে পৌঁছুবার হয়তো কোনো সম্ভাবনা নেই। সীমান্ত পার হয়ে যদি ওপারের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের হাতেও পৌঁছায়, তাহলে তাঁরা কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। ওপার-বাংলার বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মন কবিতায় গড়া। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটির স্পন্দনই কবিতা। যে কবিতার আত্মা (content) বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। তাই তাঁরা রবীন্দ্রসুরে সুর মিলিয়ে বুলেটবিদ্ধ যন্ত্রণা বুকে চেপেও গাইতে পারেন:

"মেশিনগানের পাশেতে গাই জুঁই ফুলেরই গান।"

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা, বাঙালীবিদ্বেষী ডিক্‌টেটাররা চেয়েছিল তাদের উপনিবেশকল্প ভূতপূর্ব "পূর্ব পাকিস্তানে" রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ করতে, রবীন্দ্রবীণা আছড়ে ভেঙে ফেলতে, উর্দুর ছুরিকাঘাতে বাংলা মায়ের হৃদপিণ্ড থেকে বাংলা ভাষা উপড়ে ফেলে দিতে। কিন্তু পারেনি। তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কবিতাবিপ্লবী, মাতৃভাষাবিপ্লবী রবীন্দ্রবিপ্লবী সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর দুর্জয় প্রতিরোধে। বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা রক্ষায় দৃপ্ত পরাক্রমে তা'রা দলে দলে গুলিতে, বেওনেটের খোঁচায় প্রাণ দিয়েছে তবু জোর করে তাদের ওপর চাপানো বিজাতীয় ভাষার আধিপত্য মেনে নেয়নি। তারা সীমাহীন দুঃখসহনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বুকভরা কবিতার মন্ত্রপূত বীর্যে, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনায়, মাতৃনামের অক্ষয়কবচ বুকে বেঁধে। যার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমনের সুযোগ্য

নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে ঘটে গেছে কবিতাবিপ্লব, ঘটেছে রবীন্দ্রবিপ্লব। কুটিল শত্রুর সঙ্গে প্রশান্তচিত্তে বোঝাপড়া করার পূর্বমুহূর্তেও মুজিবরের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়নি কোনো রাজনৈতিক শ্লোগান, উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অভয় সঙ্গীত :

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার !"

পাক সেনাপতির মুখের ওপর কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শুনিয়েছে :

"এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।"

* *

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।"

[—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

পূর্ববঙ্গের গণনির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার শয়তানী অভিসন্ধিতে পাক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়ে ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচীতে ফিরে যেতে না যেতেই পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাতকোটি বাঙালির বিরুদ্ধে শুরু করে দিলেন অঘোষিত যুদ্ধ। চীন মার্কিন সোভিয়েত থেকে পাওয়া উন্নত ধরণের সমরাস্ত্র রাইফেল, মেশিনগান, ফিল্ডগান, মর্টার, নাপাম বোমা, জেট, ডেস্ট্রয়ার, ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড নিয়ে জল স্থল আকাশ থেকে সহস্র সহস্র হানাদার শান্তিপ্রিয় পূর্ববঙ্গবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার হিংস্র উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই প্রবল শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলার কঠোর শপথ নিয়ে রুখে দাঁড়ালো সাড়ে সাতকোটি কাব্যপ্রেমিক বাঙালি। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো নজরুল-গীতি :

অভিযানের বীর সেনাদল,
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্ !
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল
গাও প্রভাতের গান !
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান !"

প্রবল ও হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশের নগরে, সহরে, গ্রাম-গ্রামান্তে। এই মরণপণ লড়াই-এর

ভীষণতার কথা কলকাতা তথা ভারতের নিরাপদ অঞ্চলে বসে কল্পনাও করা যাবে না। শত্রুপক্ষের ভারি ভারি কামানের মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে, ও আকাশ থেকে নির্বিচার বোমা ফেলার আগ্নেয় বিস্ফোরণে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি ধূলিসাৎ করছে হিংস্র নরদানবরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সারি সারি দাঁড় করিয়ে এই পশুরা গুলি করে মেরেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমন কি শিশুরাও রেহাই পায়নি। হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ভীষণতাও পাকিস্তানী নৃশংসতার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। দুর্জয় প্রতিরোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে অরিন্দম বাংলাদেশের মুক্তিকামী যজ্ঞবেদীতে। অবিভক্ত ও বিভক্ত ভারতের ইতিহাসে এই ধরণের সর্বাত্মক প্রতিরোধের লড়াই, এই ধরণের ঐক্যবদ্ধ ও অভীক আত্মোৎসর্গের ন্যায়যুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। নতুন ইতিহাসের, নতুন গণঅভ্যুত্থানের জ্বলন্ত অধ্যায় সৃষ্টি করলেন সাড়ে সাতকোটি বাঙালি। ইতিমধ্যেই পর্যুদস্ত হানাদাররা দিকে দিকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের বড় বড় অঞ্চলগুলি শত্রুকবল মুক্ত করেছেন। গঠিত হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গকেশরী শেখ মুজিবর রহমান। মুজিবরই পূর্ববঙ্গের নামকরণ করেছেন 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের জাতীয় কবিরূপে সম্মানিত হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা সোনার বাংলার অনুপম প্রশস্তি গান:

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি।
তোমার এই খেলা ঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।

তুই   দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে
তখন   খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি।

ধেনুচরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা তোমার চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে
দে গো তোর পায়ের ধুলো সে যে আমার মাথার মাণিক হবে
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায় হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

বাংলাদেশের গরবিনী দুর্বারিনী পদ্মা নদীর কূলে পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে বসে একদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্যামলাবণ্যে ভাস্বতী স্বর্ণশস্যময়ী বাংলাদেশকে দেখেছিলেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে। নব যুগস্রষ্টা কবির এই তপস্যামন্দিরেই তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতা, ছোট গল্প নাটক, উপন্যাস ও চিঠিপত্র রচনা করেছিলেন।[১] হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অগণিত কাব্যপ্রেমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ ও বাণীর আলোকে মানবতার অমল চেতনায় উদ্দীপ্ত হতেন। দুঃখজয়ের ও দুঃখসহনের অভয় সঙ্গীতে কবিগুরু তাঁদের পল্লীজীবনকে উজ্জীবিত করতেন। প্রগতিশীল নাগরিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং পল্লীবাংলার নিরভিমান লোকসংস্কৃতির উদার মিলনতীর্থ ছিল শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। কুষ্টিয়া মহকুমার উত্তর দিকে পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী বাট বিঘা জমির ওপর আম্রকাননবেষ্টিত এই সুরম্য কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে সপরিবারে চলে আসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আনুমানিক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার থেকে বহুদূরের এই নির্জন পল্লীকুঠী

১। ছিন্নপত্র, গল্পগুচ্ছ, গীতাঞ্জলির কিছু গান, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কণিকা, কথা, কাহিনী, ক্ষণিকা, গোরা, চিঠিপত্র (১ম খণ্ড) প্রভৃতি।

এই সময় সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন কুষ্টিয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সর্বদাই এখানে আসতেন। শুধু সাহিত্যালাপ নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর উদ্যানপরিচর্যায় ও সজী ক্ষেতে ফসল উৎপাদন সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিতেন। কৃষিবিজ্ঞানী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্যারিস্টার লোকেন পালিত, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি বঙ্গসংস্কৃতির দেশবরেণ্য নায়করা এই কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে শুধু সাহিত্যচর্চা নয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে তা নিয়ে এই মনীষীদের চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। জাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ইতিহাসবিখ্যাত কুঠিবাড়িটি পশ্চিম পাকিস্তানের বোমারু বিমান-বাহিনী নির্বিচার বোমাবর্ষণে ধ্বংস করেছে। রবীন্দ্রস্মৃতিশোধ পূর্ব বাংলার উত্তরাঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার এও এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। কিন্তু কোটি কোটি বাঙালির মানসলোকে যে কাব্যময় কুঠিবাড়িটি রবীন্দ্রস্মৃতির শাশ্বত উপাদানে গড়ে উঠেছে, সেই অবিনাশী ঐতিহ্যদেউলটিকে ধ্বংস করার শক্তি শত শত আলেকজাণ্ডার-চেঙ্গিস-নাদির-ইয়াহিয়ার নেই। রবীন্দ্রঐতিহ্য আজ শুধু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের বীর বাঙালিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিপন্ন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের আকাশ বাতাস নদ নদী ও বিশাল ভূখণ্ড রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যেও রবীন্দ্রচেতনার অভীক মন্ত্রময়তায় সদা জাগ্রত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে একজাতি একপ্রাণ অদ্বৈতরূপিণী বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর একটানা পঁচিশ বছর ধরে জিন্না-আয়ুব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্র ওপার-বাংলার সাড়ে সাতকোটি বাঙালীকে শরিয়তী শাসনের বুটের তলায় দাবিয়ে রাখার শাণিত উন্মত্ততায় চরম নিপীড়ন চালিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের প্রবল প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু মুজিবরের বাংলাদেশ আজ তাদের দর্পচূর্ণ করে পবিত্র মাতৃভূমির বুক থেকে তাদের চিরকালের মতো বিতাড়িত করার জন্য কৃতসংকল্প। বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে আমরা, এপার-বাংলার প্রগতিশীল কবিরা গর্বিত ও উদ্বুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্যদানের জন্য এবং নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে

স্বীকৃতি দানের জন্য বাংলাদেশের নবীন রাষ্ট্রনায়করা বিশ্ববাসীর দরবারে আবেদন জানিয়েছেন। দুঃখের বিষয় কূটরাষ্ট্রনীতির অ-মানবিক অনুশাসনে বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের বড় বড় শরিকরা সাড়া দেননি। ছোট ছোট দেশগুলিও বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণে নীরব। কিন্তু আমাদের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকায় নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। একটি মানবশরীরের অর্ধাংশে নির্মমভাবে আঘাত হানলে, অপরাংশেও সে আঘাতের যন্ত্রণা যেমন সমানভাবে সঞ্চারিত হয়, অবিকল সেই একইভাবে অখণ্ড বঙ্গশরীরের পূর্বাংশের যন্ত্রণায় পশ্চিমাংশও অচ্ছেদ্য সহানুভূতিতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। বিশেষ করে সংবেদনশীল কবিরা, যাঁরা দেশের রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্তা নন, যাঁদের হাতে নেই সক্রিয় সাহায্যদানের উপযোগী সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। কবিদের সম্বল, তাঁদের নৈতিক অস্ত্র কবিতা। যে কবিতা গীতা বাইবেল কোরাণের মন্ত্রাবলীর চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। কবিতার অনলছন্দে জলন্ত সমর্থন জানানো ছাড়া বাংলাদেশের আবেদনে কবিদের পক্ষে সাড়া দেবার অন্য উপায় নেই। ভূমিকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি "রক্ততিলকে" নবযুগচারণদের কবিতাবলী সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি আমি পড়িনি। সুতরাং এগুলির রসবিচারের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। আমি শুধু অনুমান করতে পারি যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবীণ ও নবীন কবিরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সম্প্রতি যে সব কবিতা রচনা করেছেন সেইগুলিই এ সংকলনের বেশির ভাগ কবিতা। বাকি কবিতাগুলি একই বিষয়ের না হলেও সম্পাদকযুগলের মুখে শুনেছি সেগুলিও দেশাত্মবোধক ও যুগধর্মান্বিত কবিতা। 'রক্ততিলক' সম্পাদনা করেছেন শ্রীমান মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই কাব্যরসিক এবং নিজেরাও কবি। সেজন্য এই ধরণের সময়োপযোগী সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনের কাজে এঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। ইতিপূর্বে শ্রীমান মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্মসম্পাদনায় "বিশ শতকের বাংলা কবিতা" নামে একখানি কবিতা সংকলন বেরিয়েছিল। গত পাঁচ বছর ধরে 'প্রগতি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও মৃণালের সম্পাদনায় নিয়মিত বের হচ্ছে। এই সাহিত্যনিষ্ঠ সম্পাদকযুগল স্থির করেছেন "রক্ততিলক" বইখানির বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ এঁরা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে দান করবেন। এঁদের এই সাধুসংকল্প দেশবাসীর কাছে অভিনন্দনযোগ্য।

বৈশাখ,

এই সময় সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন কুষ্টিয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সর্বদাই এখানে আসতেন। শুধু সাহিত্যালাপ নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর উদ্যানপরিচর্যায় ও সজী ক্ষেতে ফসল উৎপাদন সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিতেন। কৃষিবিজ্ঞানী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্যারিস্টার লোকের পালিত, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি বঙ্গসংস্কৃতির দেশবরেণ্য নায়করা এই কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে শুধু সাহিত্যচর্চা নয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে তা নিয়ে এই মনীষীদের চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। জাতীয় ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই ইতিহাসবিখ্যাত কুঠিবাড়িটি পশ্চিম পাকিস্তানের বোমারু বিমান-বাহিনী নির্বিচার বোমাবর্ষণে ধ্বংস করেছে। রবীন্দ্রস্মৃতিসৌধ পূর্ব বাংলার উত্তরাঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার এও এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। কিন্তু কোটি কোটি বাঙালির মানসলোকে যে কাব্যময় কুঠিবাড়িটি রবীন্দ্রস্মৃতির শাশ্বত উপাদানে গড়ে উঠেছে, সেই অবিনাশী ঐতিহ্যদেউলটিকে ধ্বংস করার শক্তি শত শত আলেকজাণ্ডার-চেঙ্গিস নাদির-ইয়াহিয়ার নেই। রবীন্দ্রঐতিহ্য আজ শুধু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের বীর বাঙালিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিপন্ন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের আকাশ বাতাস নদ নদী ও বিশাল ভূখণ্ড রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যেও রবীন্দ্রচেতনার অভীক মন্ত্রময়তায় সদা জাগ্রত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে একজাতি একপ্রাণ অদ্বৈতরূপিণী বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর একটানা পঁচিশ বছর ধরে জিন্না-আয়ুব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্র ওপার-বাংলার সাড়ে সাতকোটি বাঙালীকে শরিয়তী শাসনের বুটের তলায় দাবিয়ে রাখার স্পর্ধিত উন্মত্ততায় চরম নিপীড়ন চালিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের প্রবল প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু মুজিবরের বাংলাদেশ আজ তাদের দর্পচূর্ণ করে পবিত্র মাতৃভূমির বুক থেকে তাদের চিরকালের মতো বিতাড়িত করার জন্য কৃতসংকল্প। বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে আমরা, এপার-বাংলার প্রগতিশীল কবিরা গর্বিত ও উদ্বুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্যদানের জন্য এবং নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে

স্বীকৃতি দানের জন্য বাংলাদেশের নবীন রাষ্ট্রনায়করা বিশ্ববাসীর দরবারে আবেদন জানিয়েছেন। দুঃখের বিষয় কূটরাষ্ট্রনীতির অ-মানবিক অনুশাসনে বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের বড় বড় শরিকরা সাড়া দেননি। ছোট ছোট দেশগুলিও বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণে নীরব। কিন্তু আমাদের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকায় নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। একটি মানবশরীরের অর্ধাংশে নির্মমভাবে আঘাত হানলে, অপরাংশেও সে আঘাতের যন্ত্রণা যেমন সমানভাবে সঞ্চারিত হয়, অবিকল সেই একইভাবে অখণ্ড বঙ্গশরীরের পূর্বাংশের যন্ত্রণায় পশ্চিমাংশও অচ্ছেদ্য সহানুভূতিতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। বিশেষ করে সংবেদনশীল কবিরা, যাঁরা দেশের রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্তা নন, যাঁদের হাতে নেই সক্রিয় সাহায্যদানের উপযোগী সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। কবিদের সম্বল, তাঁদের নৈতিক অস্ত্র কবিতা। যে কবিতা গীতা বাইবেল কোরাণের মন্ত্রাবলীর চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। কবিতার অনলছন্দে জ্বলন্ত সমর্থন জানানো ছাড়া বাংলাদেশের আবেদনে কবিদের পক্ষে সাড়া দেবার অন্য উপায় নেই। ভূমিকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি "রক্ততিলকে" নবযুগচারণদের কবিতাবলী সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি আমি পড়িনি। সুতরাং এগুলির রসবিচারের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। আমি শুধু অনুমান করতে পারি যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবীণ ও নবীন কবিরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সম্প্রতি যে সব কবিতা রচনা করেছেন সেইগুলিই এ সংকলনের বেশির ভাগ কবিতা। বাকি কবিতাগুলি একই বিষয়ের না হলেও সম্পাদকযুগলের মুখে শুনেছি সেগুলিও দেশাত্মবোধক ও যুগধর্মান্বিত কবিতা। 'রক্ততিলক' সম্পাদনা করেছেন শ্রীমান মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই কাব্যরসিক এবং নিজেরাও কবি। সেজন্য এই ধরণের সময়োপযোগী সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনের কাজে এঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। ইতিপূর্বে শ্রীমান মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্মসম্পাদনায় "বিশ শতকের বাংলা কবিতা" নামে একখানি কবিতা সংকলন বেরিয়েছিল। গত পাঁচ বছর ধরে 'প্রগতি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও মৃণালের সম্পাদনায় নিয়মিত বের হচ্ছে। এই সাহিত্যনিষ্ঠ সম্পাদকযুগল স্থির করেছেন "রক্ততিলক" বইখানির বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ এঁরা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে দান করবেন। এঁদের এই সাধুসংকল্প দেশবাসীর কাছে অভিনন্দনযোগ্য।

১ই বৈশাখ, ১৩৭৮ বিমলচন্দ্র ঘোষ

বাংলা দেশে প্রাণের বিপুল প্রবাহ মুক্তির নেশায় সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে সূর্যের মতো দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সে প্রবাহ আজ বজ্রের মতো নির্ভয়।

এই বিপুল প্রবাহকে কে রুখবে? দিকে দিকে তাই এখন তার জয়যাত্রা। এ জয়যাত্রা মানুষের চিরকালের ইতিহাসে সূর্যের আলোয় লেখা হয়ে থাকবে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা দেশের কবিকণ্ঠে কখনও ধ্বনিত হচ্ছে সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, আবেগে উত্তেজনায় কবিকণ্ঠ কখনও উত্তাল হয়ে উঠছে আবার।

সেই কণ্ঠকেই শ্রীমৃণাল চট্টোপাধ্যায় ধরে রাখলেন এ সংকলনে। তিনি আগামীকালের মানুষের কাছেও এর জন্য ধন্যবাদার্হ হবেন নিশ্চয়ই। আমরাও এই মুহূর্তে তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। সংযুক্ত-সম্পাদক শ্রীঅমিয়ধন মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য সর্বতোভাবে সহযোগিতার জন্য। জয় বাংলা!

সবিনয় নিবেদন

খুব কম সময়ের মধ্যে 'রক্ততিলক' কাব্য সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ নবীন প্রবীণের কবিতা সাজাবার কোন সুযোগই পাইনি। যখন যাঁর কবিতা পেয়েছি মনোমত হলেই ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।

সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গের গণ আন্দোলন ও মুজিবরের ভূমিকায় বাঙলা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতাই বিষয় বস্তু স্থিরীকৃত ছিল। অতএব ফরমাইসী লেখা সবার ভাল নাও লাগতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের ভাল লাগা না লাগার ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। বলে রাখা ভাল অধিকাংশই নতুন কবিতা।

আমরা মনে করি কেউ একটিও কবিতা লেখেন এবং সেটি যদি কবিতা হয় তবে তা সংকলিত হতে পারে। তাও স্থায়ীভাবে রাখার প্রয়োজন আছে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিছু তরুণ কবির কবিতাও ছেপেছি। ধৃষ্টতা মার্জনীয়।

রক্ততিলক কাব্য সংকলন পরিকল্পনার মূল উৎসাহদাতা শ্রদ্ধেয় কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়। যুগান্তর পত্রিকার দপ্তর থেকে বেশ কিছু কবিতা দিয়েও সাহায্য করেছেন তিনি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা উল্লেখ্য।

তাছাড়াও বন্ধুবর সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখ সালাউদ্দিন যদি বাঙলা দেশের সাহায্যের আবেদন নিয়ে না আসতেন তবে রক্ততিলক প্রকাশে এতটা তৎপর হতাম কিনা জানি না! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই সংকলনের লভ্যাংশ বাঙলা দেশের সাহায্য ভাণ্ডারে দেওয়া হবে।

যশস্বী কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গুরুতর অসুস্থতার মধ্যেও রক্ততিলক কাব্য-সংকলনের মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কাব্য রসিক পাঠক মাত্রেই এই ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উপদেশও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সংযুক্ত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কবি ও সাহিত্যিক অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়ের সর্বতোভাবে সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ সাধ্যাতীত ছিল। রণজিৎ করের সহযোগিতাও মনে রাখার মত। আনন্দবাজার, যুগান্তর,

দেশ, অমৃত ও কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত 'স্বদেশ, আমার স্বদেশে'র সৌজন্যে কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাছাড়াও যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়, কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অসিতকুমার আদিত্য, জে, বি, পালিত, শান্তিময় মুখোপাধ্যায় ও প্রগতি'র প্রাক্তন সম্পাদক আশুতোষ ধর এবং সভাপতি অনিলকুমার চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

প্রগতির একান্ত অন্তরঙ্গ স্বর্গত শৈবাল (মনি) চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রগতি'র কয়েকজনের শুভ প্রচেষ্টা মনি প্রকাশনী, তরুণ কবি সাহিত্যিকদের রচনাবলী, পুস্তকাকারে প্রকাশ ও প্রচার করাই মণি প্রকাশনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রগতি'র পক্ষে মণি প্রকাশনীর ৪র্থ নিবেদন 'রক্ততিলক'! বিশ শতকের বাংলা কবিতা, তারায় আলো, রক্ত আঁখি কোস্ত ক্যাকটাস, পূর্বের প্রকাশিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। পঞ্চম নিবেদন গল্প সংকলন (প্রস্তুতি চলছে)।

'প্রগতি'র পরবর্তী সংখ্যাটি ও বাংলা দেশের ওপর বাংলা দেশের সাহায্যার্থে। রক্ততিলকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ত্রুটি সম্বন্ধে আরো সতর্ক হবার আশা রাখি। সময় মত কবিতা না পাওয়ায় কিছু প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতা সংকলিত করতে পারিনি। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় অজাতশত্রু কবি নরেন্দ্রদেব মহাশয় রক্ততিলকে লিখবেন বলেছিলেন এবং রাধারাণী দেবীও। নির্দিষ্ট দিনে ফোন করতে নবনীতা সেন বললেন, 'তিনি নেই।' বাংলা দেশের অসংখ্য আত্মীয় বন্ধুর অপমৃত্যু ব্যথার সঙ্গে আর একটি সময়োচিত মৃত্যু বেদনাও হৃদয়ের অন্তঃস্থল মথিত করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। যিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তিনি আর নেই, একথা যেন ভাবতেই পারছি না।

বাঙলা দেশের ছড়া

ওপারের কবিতা

পদ্মা-মেঘনার মর্মবাণী

(১) 'আমি রব বাংলার
পায়ে পায়ে'

(২) 'এ লড়ায়ের শেষ
অত সহজেই নয়
এ লড়াই
বাঁচা মরার লড়াই'

(৩) কোটি সূর্যের শোভাযাত্রায়
আমার দেশ সোনা হোক

(৪) সঞ্চয়ী জ্বালার বিস্ফোরণে
ইতিহাস প্রস্তুত হচ্ছে
নতুন যুগের

(৫) এ পৃথিবী আমাদের
এ পৃথিবী সকলের
এ পৃথিবীর মানুষ
ধ্বংস সহ্য করবে না

(৬) এখন প্রতিদিন কিছু না
কিছু ঘটছে
বিন্দু বিন্দু অন্ধকার সরছে

(৭) গুলি বারুদ
জেল বেয়নেট দিয়ে
দখল করা
হে নগরী···আমরা প্রস্তুত
থাকবো।

(৮) ধূ-ধূ বাংলায়
ডাক দিয়ে যায়
স্বপ্নের দিনগুলি
মিছিলে যেদিন
আমার ভায়ের বুকে
বিঁধেছিল গুলি।

কালিদাস রায়

বঙ্গভূমি

নমি শ্যামা মৃগাজিন-বসনা
কূজন-গুঞ্জ-কল-ভাষণা ॥
মঠে মঠে পূজা তব   তটে তটে বৈভব,
দেশে দেশে তব যশোঘোষণা ॥

ঘনবট-সুশীতলা,   নবঘন-কুন্তলা,
সরসিজ-বিলোচনা,   স্ফুট-নীপ কুণ্ডলা,
উশীরাগু চর্চিতা   ধূপদীপে অর্চিতা
কুন্দ-কোরক-রুচি-দশনা ॥

স্নেহ তব খনিভরা,   তরুভরা বনভূষা,
শ্রিতফণি-মণিমালা,   শুক্ত হেম মঞ্জুষা,
গিরিবন্ধুর দেহা   বেতস-কুঞ্জ গেহা,
বিরচিত-মীনগুণ রশনা ॥

হ্রদ নদ গদগদ   মধুনাদ বন্দিতা
চমরী বীজিত কায়া   মৃগমদ গন্ধিতা
সিন্ধু দোলন ধৃতা   সুরধুনী-ধারাপূতা
তুষার-সুশীত-সিত হসনা ॥

মণীশ ঘটক

সূর্যপ্রণাম

যেখানে টীকে দেয়
বাঁহাতের সেই খানটা কেটে দিলাম
ধারালো ছুরি দিয়ে
গল গল করে রক্ত বেরোল
ধরলাম কাঁচের গেলাসে।
পুব দিকে তখন সূর্য উঠছে,
আমার জানালা থেকে
কদ্দূর আর হবে,
মাইল চল্লিশ,—পদ্মাপারের রাজসাহী।

কাঁচের গেলাস ভরা রক্ত
উঠন্ত সূর্যের দিকে তুলে ধরলাম,
কই, কোথায় রক্ত ?
যমুনা-পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-
বুড়িগঙ্গা-শীতলাক্ষী-সুরমা-কপিরাধা
কর্ণফুলী-আড়িয়াল খাঁর
তীর্থ সলিল টকটকে লাল
নবোদিত সূর্য কিরণে
চারটি বাংলা হরফে রূপায়িত হয়ে গেছে
মুজিবর।

সেই রক্ত ভরা
সেই তীর্থ সলিল ভরা
স্ফটিক পাত্র মাথায় তুলে ধরে
সূর্য প্রণাম করলাম ॥

অমিয় চক্রবর্তী

ঘরে ফেরার দিন

সেখানে সে ভোর-লাগা আকণ্ঠ সবুজ ভক্তি গ্রামে
সম্পূর্ণ আপন তবু অচেনার বাঁকে,
তৃপ্তি-নদী তীরে থাকে ;
বাংলার হাওয়ায় আগমনী

পুজোর আগেই শোনা কালাংড়া সানাইয়ে তার ধ্বনি
আশ্বিনের চুলে তার সূর্যমাল্য সোনায় পরানো,
ভ্রূরেখায় নত চোখে লাবণ্য ঝরানো,
কারুণ্যে কাজল দৃষ্টিমণি।
অচিহ্ন অবনী পারে অন্তর্লীন
যে-মুহূর্তে তার কাছে আসি।
ঘরে-ফেরা দিন

দূর দূর কোটি স্তর
দূর দূরান্তর
অসংখ্যের দিন-সংখে মিলায় দিগন্তে পরবাসী ;
স্মৃতি তার অশ্রু মেখে
পল্লীপথে বুকে জেগে
প্রেমের কম্পিত ছায়া পটে
গঙ্গার দেউল আঁকা তটে
এ জন্মের শেষ চাওয়া ঢেউএ ঢেউএ নিচে চলে যায়
এক বেষ্টনীর নীল সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় ॥

বনফুল

সহস্র সেলাম

পলে পলে মোরা যবে পঙ্ককুণ্ডে ডুবিতেছিলাম,
নিরুদ্ধ আক্রোশে যবে আমাদের পুঞ্জিত পাতক
আমাদেরই হত্যা করি' নিঃসঙ্কোচে ঘোরে অবিরাম,
আমাদেরই আত্মবন্ধু পুত্র ভ্রাতা কশাই ঘাতক
গুণ্ডা ও ডাকাত যবে, মহত্ত্বের মাণিক্য-ভাণ্ডার
চূর্ণিত লুণ্ঠিত করি মহোল্লাসে মেতেছে তাণ্ডবে
প্রমত্ত প্রমথ দল, সুখ স্মৃতি পুণ্য বাংলার
অসম্মানে মুহ্যমান, স্বার্থ-বহ্নি আদর্শ-খাণ্ডবে
দগ্ধ করি লেলিহান দিগ্বিদিকে, বিদলিত যবে
সর্ব সুখ সাধ আশা পশুত্বের অহং-আহবে
তখনও ওপার হতে দৃপ্তকণ্ঠ শুনিলাম কার
জয় বাংলার !

আমার তোমার নয়, চাও তুমি বাংলার জয়
তারই লাগি মৃত্যুমুখে আগাইয়া গিয়াছ নির্ভয়,
তোমার বিরাট সত্তা আজি তাই হিমাদ্রি-সমান
বাঙালীর সর্ব গর্ব তোমাতেই আজি দ্যুতিমান।
আমি বাংলার কবি তাই বন্ধু ছুটিয়া এলাম
মুজিবর রহমন লহ মোর সহস্র সেলাম।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাংলা দেশ

নয় কোনো ফাঁকা গোল টেবিলের
ঠকের বৈঠক,
কাঁটে কাটা বোয়েদাদ
ক্ষুদ্র লুব্ধ কৃপণের ধূর্ত ফয়সালা,
না বা কোনো দেয়ালে পোস্টার
শৃঙ্গশুঙ বুলির দাপট—
এ এক পৃথক মূর্তি,
আরেক অস্তিত্বে এসে
এ এক পৃথক উচ্চারণ—
হৃদয়ের আদিগন্ত অনাবৃত উদধি-উন্মেষ,
রিক্ত হাতে মুখোমুখি নির্লজ্জ মৃত্যুর মোকাবিলা
লক্ষ লক্ষ মরণেও রক্তবীজ প্রাণ অনিঃশেষ—
নাম শোনো গান শোনো
স্থলে-জলে স্থাবরে-জঙ্গমে
বাংলা দেশ বাংলা দেশ
স্বাধীন নবীন বাংলা দেশ।

গর্জমান ব্রহ্মপুত্র, প্রমত্ত ভৈরব
পদ্মা মেঘনা করতোয়া ত্রিস্রোতা গোমতী
মহানন্দা কর্ণফুলি সুনন্দা কুমার
নদী নালা খাল বিল এক সুরে খরশাণ মন্দ্রিত স্পন্দিত
তরঙ্গে তুমুল কলরোল
বন্দরে বন্ধনকাল হয়ে গেছে শেষ,
জেগেছে নতুন রাজা—
প্রত্যয়ে অচল থেকে প্রত্যেকে সৈনিক
প্রত্যেকেই বীর নেতা বর্বরের বিপুল উচ্ছেদে,
এক তন্ত্রে গাঁথা মন্ত্র

রব না রব না আর বিদেশীর ভোগোপনিবেশ,
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
সোনার শ্যামল বাংলা দেশ।

উত্তরে সৈয়দপুর দক্ষিণে সন্দীপ
অটলা চট্টলা পুবে, পশ্চিমে যশোর
নয় কোনো সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের রেখা
মানচিত্রে পরিমিত—
এই এক মহান মানসলোকে
মহাতীর্থে মানবগৌরবে
উত্তরণ করে দেওয়া আমারে-তোমারে
বিশ্বজগতেরে,
শিরায় লাগিয়ে দেওয়া আগুনের সুর—
ধর্মের চেয়েও বড়ো মর্মের সংবাদবাহী মুখের যে ভাষা,
মোক্ষের চেয়েও বড়ো শোষণের পীড়নের মুক্তির পিপাসা।
এই এক অবধি-পরিধি-হীন দিব্য পরিবেশ
যেথা আমি-তুমি প্রতিবেশী
পরস্পর বন্ধুতার নিবিড় আশ্লেষ,
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
ঘনিষ্ঠ গরিষ্ঠ বাংলা দেশ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভৌগোলিক

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিম টিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা ;
—তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে,
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে-দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে,

তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের
ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণের সুন্দর বন
উত্তরে টেরাই।

বিষ্ণু দে

আমরা

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে।
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ।
দুর্লভ প্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
অপমৃত্যু মুহূর্তে কি উচ্ছ্বসি'—

আবির্ভূতা—এ কি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?
প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিশ্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে।

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯২৮

ক দিন ধ'রে জোর হাওয়া দক্ষিণ থেকে, বাইরে ওড়ে ধুলো
আর শুকনো পাতা, টেবিলের কাগজপত্র ছত্রখান—
জোর হাওয়া, যেমন বইতো মস্ত ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে
পুরানা পল্টনে, চৈত্রমাসের সবুজ কোনো সকালবেলায়।
সবুজ হ'য়ে ছড়িয়ে আছে রমনা, আমার উনিশ
বছর বয়সের মতো সবুজ। শান্ত নির্জন রাস্তা দিয়ে
আমি হেঁটে চলেছি আমার ডাইনে-বাঁয়ে বাগান
আর ছবির মতো একটি-দুটি বাড়ি। চুপচাপ—
শুধু সাইকেলের ঘুন্টি মাঝে-মাঝে, আর গাছপালায়
ঝিরঝির শিরশির। আমার চোখ জুড়ে রোদ্দুর-মাখা
আকাশ, আমার মনের মধ্যে বাতাস ব'য়ে যায়
ভবিষ্যৎ।
আর আজ শুনছি সে-সব রাস্তায় সাঁজোয়াবাহিনী।
আর বন্দুক আর ধ্বংস আর উন্মত্ততা। গুঁড়িয়ে
যায় হাজার-হাজার ভবিষ্যৎ, আগুন জ্বলে
রক্ত-ঝঞ্জা প্রচণ্ড।
সত্যি ? এ কি সত্যি হ'তে পারে ?

লম্বা কড়িভরা গম্ভীর, ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ বইয়ের
গন্ধে ভরা লাইব্রেরি, কমনরুম শব্দমুখর

কেনিল। ক্লাশে ব'সে কখনো আসে ঝিমুনি,
কখনো কোনো সহপাঠিনীর চোখ চঞ্চল, আর
কখনো এক বিশাল স্তব্ধতার ফাঁকে-ফাঁকে
কার্ডেলিয়ার অতি কোমল কণ্ঠস্বর শুধু চুইয়ে পড়ে।
একটা ভারি মন্থর মালের ট্রেন মন্দাক্রান্তার উপর দিয়ে
গড়িয়ে-গড়িয়ে চ'লে যায়, বাইরে বেলা পড়ন্ত।
আমরা ব'সে আছি গোল হ'য়ে ঘাসের উপর, চা খাচ্ছি,
আমাদের হাসির শব্দ উড়ে যায় যেন পাখির ঝাঁক,
জীবনটাকে মনে হয় এক উৎসব।

আর আজ শুনছি বিধ্বস্ত সেই বিদ্যাপীঠ। সব
মিনার লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, সব বই ভস্মীভূত হয়তো,
প্রান্তরগুলি কবরের মতো হাঁ ক'রে আছে—
যৌবন আর স্বাধীন মন আর সুন্দর মহান প্রাচীনতাকে
গ্রাস করার জন্য।

সত্যি? এ কি সত্যি হ'তে পারে?

পারে, হ'তে পারে, সবই সম্ভব, ইতিহাসে অনেক
সাক্ষী তৈরি। কিন্তু কী আমি দিতে পারি, বলো,
কোন উপহার পাঠাতে পারি তোমাদের জন্য,
কোন উপহার সত্যিকার আমার—শুধু এই বাতাস
ছাড়া যা ব'য়ে যায় আমার মনের মধ্যে যেন
অতীত? ফিরে আসে লুপ্ত সময়ের উপর দিয়ে
সেই চৈত্রমাস, প্রীতি আর বন্ধুতার সৌরভ
নিয়ে, আমার চোখে রোদ্দুর-মাখা সবুজ ছড়িয়ে,
ঝরা পাতার শব্দের মতো কোমল, পুরোনো পুঁথির
নিশ্বাসের মতো মধুর, উনিশ বছর বয়সের
মতো আশান্বিত—আমার কানে-কানে
যেন ব'লে যাচ্ছে যে অতীত কখনো লুপ্ত হবে না!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ইস্পাতসূর্য মুজিবর

ইস্পাতে গড়া শাণিত সূর্যের মতো
অভিশপ্ত বাংলার যন্ত্রণার অন্ধকার ফুঁড়ে
তুমি বেরিয়ে এলে মুজিবর!
তোমার জলন্ত আবির্ভাবের আলোয়
আমরা স্তম্ভিত।

বিপ্লবী কবি নজরুল একদিন আমাদের বুকে
সিংহচেতনা জাগাতে
শ্বেতাম্বরা সরস্বতীকে বলেছিলেন :
"টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা
গলহার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি!"

আমরা আপোষে উপোষে ভীরুতায় ক্লৈব্যে
অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে পারিনি।
আমরা শ্রেণীসংগ্রাম ভুলে
বিপ্লবের মহান আদর্শ ভুলে
দলীয় স্বার্থপরতার ঘৃণিত উত্তেজনায়
চোরের মতো
গুপ্তঘাতকের মতো
ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়েছি,
অখণ্ড দেশকে
খণ্ড খণ্ড করেছি
দলাদলির পৈশাচিক চক্রান্তে।

আমাদের লজ্জা দিয়ে
আমাদের নীরব ভ্রুকুটিতে ধিক্কার দিয়ে

হে মহাজাগরণের মহান উদ্গাতা মুজিবর,
শোনালে তোমার অভিবিক্রম সমুদ্রস্বর
যে উদাত্ত গম্ভীর স্বরধ্বনি
বিদ্যাসাগর মাইকেল রবীন্দ্রনাথ নজরুলের
অভীক মন্ত্রদীক্ষায় অকম্পিত।

বঙ্গকেশরী মুজিবর,
আজ তুমি সর্বহারার চির আকাঙ্ক্ষিত
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আভিজাত্যে
অপমানিতা বাংলাদেশকে সম্মানিতা করেছ।
বঙ্গবন্ধু মুজিবর!
ভারতবন্ধু মুজিবর!
আজ তুমি তোমার সাত কোটি মাথা আকাশে তুলে,
চোদ্দ কোটি বজ্রবাহুতে খাপখোলা তরোয়াল উচিয়ে,
সৃষ্টি করেছ
বাঙালীর আত্মমর্যাদার অনন্ত ইতিহাস!
তোমাকে লাখো সেলাম মুজিবর।
তোমাকে লাখো সেলাম।

দিনেশ দাশ

বাংলা

যখন যা কিছু লিখি
খসখস করে খড়ে হাওয়া বয় ঠিকই,
তবু সবখানে তোমারই তো নাম লিখি।

যে আগুন জ্বলে শিমুলের ডালে
টকটকে লাল কুঁড়ি,
যে-আগুনে জমে আমের মুকুলে
কাঁচা সোনা গুঁড়ি গুঁড়ি:
যে প্রবাহে আজ ডাকল কোকিল
পলাশের ডালে একা,

ভোরের হলুদ হাসির রেখায়
স্বচ্ছ মেঘের সোনালী লেখায়
খয়েরী চিলের পাখায় পাখায়
তোমারই তো নাম লেখা।

তোমার নামেই আমার প্রথম
জাগল প্রাণের সাড়া,
তোমার নামেই হৃদয়ে উঠেছে
প্রথম সন্ধ্যাতারা।
তাই তো রুগ্ন শিশুর মতই
অবুঝ চোখের জলে,
তোমাকেই শুধু
ডেকে চলি নানা ছলে।
জন্ম-রুগ্ন আমি ছেলে তোর
রোগে ভুগি বারমাসই।
পরি ছেঁড়া-টেনা
কখনো খাবার জোটে কি জোটে না,
অনাহারী উপবাসী :
তবু মা তোমার কোলে কী শান্তি
তাই ঘুরে ফিরে আসি।

বারে বারে যেন ফিরে আসি এই বৃষ্টি সবুজ কোলে
খেলা করি যেন তোমার চোখের শিশিরেতে টলটলে :
শুধু মনে হয়, মরণের লাখো কালো আবলুস নদী
পার হতে হয় যদি
সাঁতারুর মত ভাসব তোমার বুকে—
জীবনের জালে লাখো-কোটি বার উঠে আসি আমি যদি
তোমার কোলেই ফিরব নানান রূপে ;
গাইব আবার গান
যে-গানে তোমারি নাম॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পারাপার

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলা দেশ
এপারেও সেই বাংলা।

সুনীলচন্দ্র সরকার

নতুন বাংলাদেশ

দেখ, বাংলাদেশের হৃদয়গুলি
আজ কেমন ক'রে
দুঃখ সুখের চেনা সীমা পেরিয়ে গেল।
বেরিয়ে এল নতুন যুগের ছেলেমেয়ে
তাদের পায়ের স্পর্শ পেয়ে
পথগুলি সব কাঁপে, যেন
যুদ্ধমদে বীরধমনী,
মাঠে ঘাটে চমক হানে
নূতন প্রাণের স্পর্শমণি।

জর্জরিতা মাটি-মাকে
দেখ ওরা দলে দলে
রক্ত দিয়ে জীইয়ে রাখে,
অনায়াসে এগিয়ে গিয়ে
মৃত্যুর দাঁত বুকে নিয়ে

চরম প্রীতি জানিয়ে গেল

কে রমণী

পথ ঘাট আজ কাঁপে, যেন

বীর ধমনী।

ধ'রে যাকে বাঁধা যায় না

সে উচ্ছ্বাসে

নদীগুলি হারিয়ে সীমা

যেন শুধুই স্বর্গে ভাসে ;

ছলছলায়, কলকলায়

নতুন যুগের রূপোল্লাসে।

ঘুচুক এবার পুরাতনের আবরণী,

সকল জীবন করুক সোনা

সেই নূতনের স্পর্শমণি।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমার তোমার মায়ের নাম

আমার তোমার মায়ের নাম বাঙলাদেশ,

বাঙলাদেশ !

আজ যদিও ছুরির ফলায় দুই ফালি,

আমার তোমার ভাইয়েরা সব বাংলাভাষী বাঙালী।

আমরা হাসি-খেলি মুক্তির গান গাই,

আমরা আনন্দে মন ভরে নিয়ে

আগুন ছড়াই

অনাচারের জঞ্জালস্তূপ করতে শেষ।

আমার তোমার মায়ের নাম বাঙলাদেশ,

বাঙলাদেশ !

আমার মায়ের ভাষা আমার ভাষা তোমার ভাষা

আহা কি বাংলাভাষা !

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্মভূমির দিকে

সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,
এইদিকে আমার স্বদেশ।
আমি এইদিকে দাঁড়িয়ে
ওইদিকে তাকিয়ে আছি।
আমি দেখছি,
আমার জন্মভূমির আকাশ রক্তে লাল হয়ে গেল।
আমি ভাবছি,
আমার বন্ধু আর সতীর্থেরা আজ কীভাবে কোথায়
দিন কাটাচ্ছে।
কী করছে খালেক আর রহিম আর আনোয়ার?
তারা কি জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে
নাকি রাস্তায় নেমে
বুকের রক্ত ঢেলে গড়ে তুলছে প্রতিরোধ?
আমি আমার অস্তিত্বকে দুই খণ্ড করে
নিজেকে বারবার শোনাচ্ছি:
সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,
এইদিকে আমার স্বদেশ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

জয় বাংলা

সুজলা সুফলা দেশ রক্তে ভাসে
মুটে মজুরের রক্ত তাঁতী জেলে ছুতোরের
নিরীহ চাষীর রক্ত শস্যে ঘাসে
কামান বন্দুক হাতে পিশাচ হাসে।

শ্যামলা সুফলা দেশ রক্তে ভাসে
গুণী জ্ঞানীদের রক্ত, যুবা বৃদ্ধ শিশু বনিতার
পবিত্র রক্তের বন্যা চক্ষে ভাসে
বোমারুর আস্ফালন নীল আকাশে।

সুজলা সুফলা দেশ রক্তে ভাসে
সহস্র বীরের রক্ত জন্মভূমির
সমস্ত কলুষ গ্লানি নিমেষে নাশে
জয়ধ্বনি মুখরিত শ্বাসে প্রশ্বাসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যদি নির্বাসন দাও

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো!
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী!

শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রূরতা গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশির কাঁপে ঘাস ফুল—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দিঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক?

আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি ?
মোষের ঘাড়ের মত পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মত বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর ?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ……
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

আশিস সান্যাল

বাংলাকে নিয়ে

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

তোমার স্বপ্নের সাধ তমিস্র অতলে
এপার ওপার হাটে ;
চেতনার মূর্তপটে পায়নাকো সাড়া।
দুপাশে দুবের মুখ
মাঝে তার পদ্মা মেঘের অতন্দ্র প্রহরা।

কোথাও পায় না খুঁজে বালিয়ার মাঠ।
ধানের সবুজ গন্ধে
আকাশের আলোড়িত নিবিড় ললাট।
সোমেশ্বরী নদীতীরে
পল্লবিত হিজলের মুখর যৌবন।
সব আজ স্মৃতি চিহ্ন
ঢেকে গেছে অন্ধকারে, শান্তিনিকেতন।

তবু মনে প্রতিদিন অবাক প্রত্যয়ে
বাজে এক নির্ধারিত গান।
সাজাদপুরের মাটি, শান্তিনিকেতন
এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

গোপাল ভৌমিক

এপার ওপার

আমরাই হাঁটি চলি
এপারে ওপারে :
জলবায়ু ভেদাভেদে
কিছুটা তফাৎ যদি মেনে নেই আকারে প্রকারে
তবু মন এক সুরে বাঁধা,
এপার আকুল শুনে ওপারের কাঁদা।

ওপারের বীর্যবত্তা ত্যাগের কাহিনী
পূবের বাতাসে ভেসে আসে
এবং এপার মাতে আনন্দ উল্লাসে
যদিও লজ্জায় মাথা হেঁট হয় হয়
অবিরাম কানে শুনে
জয় বাঙলার জয়।

এপারে মানুষগুলি
যদুবংশ নিধনে উৎসাহী
আপাতত থমকে দাঁড়ায়
ওপারে অহিংস রণ, ঐক্যবোধ দেখে।
জানি না কে ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখে
হিন্দি উর্দু অথবা বাংলায়।

শান্তনু দাস

জননী জন্মভূমি

তামাম পৃথিবী জুড়ে অন্তহীন ঘৃণা :
এমন দোসর পাওয়া গেল না
চিবুকে চিবুক রেখে ভালবাসাবাসি,
বুকের মধ্যে এক গোপন কোটরে
লুকনো ভ্রমর উড়ে যায়।

অথচ জননী : তুমি বিছিয়ে কোল
অচ্যাৎ নিয়েছো টেনে বুকে,
অথবা কি সুখে
বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

তাই :
যখন যা লিখি,
তোমার মাটিতে রাখি গরম নিঃশ্বাস,
রক্তের ভেতর জাগে ধ্বনি
দুধ মেরে যেমন নবনী
উঠে আসে ;
তেমনি বিশ্বাস, অতিদূর আলোরেখা থেকে
জেগে ওঠে রক্তজবা কুসুমের মতো ॥

হেনা হালদার

বাংলা দেশ আমার বাংলা দেশ

বাংলা দেশ আমার বাংলা দেশ
ধানে ভরা, গানে ভরা প্রাণে ভরা
বাংলা দেশ

আমি এক প্রবাসী কবি,
আমার কাছে বাংলা দেশ একটাই।
আমার এপার ওপার দুই পার ছাপিয়ে
অপার মমতা তোমার ওপর।

বাংলা দেশ আমার বাংলা দেশ
যেখানেই থাকি আমি তোমার সুখ দুঃখের শরিক।
তোমার আকাশে অন্ধকার ঘনালে
আমার চোখের আলো নিভে যায়।
তোমার মাটিতে ভূমিকম্প জাগলে
আমার শান্তির ভিত টলে ওঠে।
তোমার পূর্ণিমায় তোমার অমাবস্যায়
আমার সমুদ্রে আসে জোয়ার ভাঁটা।
তোমার দুর্ভিক্ষ, খরা বন্যা বাত্যার খবরে
আমার খাবারের থালা বিস্বাদ।

বাংলা ভাষা, আমার বাংলা ভাষা,
আমার হৃদয়হরা, আকুলকরা মধুক্ষরা
বাংলা ভাষা,
তোমার জন্যে যারা রক্ত দিলে, প্রাণ দিলে
শান্তি সুখ নিরাপত্তা সব দিলে

কেউ তারা পর নয় পরম-আত্মীয়
ভাষা-সূত্রে একান্ত আমার।
ঘৃণার দেয়াল তুলে এক দেশকে যারা
দুই দেশ বানিয়েছিল,
আজ তারা অবাক হয়ে দেখছে
দু'টি দেশের হৃদয় জুড়ে একটি ভাষা'র
আসন পাতা,
আর সেই ভালবাসার আসনে বসে আছেন
ভুবনেশ্বরী বাংলা দেশ আমার
বাংলা দেশ।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

একই ইঁটের বাড়ী

রাজনীতি দায়ভাগ আহা সে তো পদ্মপত্রে নীর
ইতিহাস বারবার বদলে যায় ভাষার ভূগোল ধ্রুব স্থির
সতত কুটিল বুদ্ধি দাবার চালিত ছকে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয়
তবুও দুপ্রান্তের পদাতিক রাজাকে উপেক্ষা করে
একই ধ্বনি ব্যঞ্জনায় তোলে শব্দময়
একই অর্থবহ কথা বলে
এতো নয় পঙ্কলিপ্ত শাসনের ঠাট বাট
একবার প্রক্ষালনে সব চিহ্ন ধুয়ে যাবে সময়ের জলে
এ এক শারীর-সৌধ
প্রাক্-চর্যাপদ দিয়ে গঠিত হয়েছে
ইঁটে ইঁটে
একাকার হয়ে আছে চুণ সুরকি লোহা লক্কড় ইতস্তত
কিছুতে হবে না ভিন্ন
যতই ছাড়তে হোক্ সাতপুরুষের মাটি ভিটে।

জীবন সরকার

ভগ্ন হৃদয়

নড়বড়ে নৌকার পাটাতনে
অন্ধকার, আব্দুল বরকতের
স্খলিত কণ্ঠের পেচাল
দেওয়ালের এপারে প্রতিধ্বনিত হয়।
খণ্ডিত হৃৎপিণ্ডে তুফান উঠনে
ভেঙে যায়—স্বপ্নসৌধ—ঘরবাড়ী
অথচ বসুমতী শোনে না
সে কান্না।
বোঝা যায়—পারাপারের সাঁকো প্রস্তুত
আর দেরী নয়—
ভাইয়ের হাতে হাত মিলাতে
এই তো সময়।......

কমল সাহা

এবার মুহূর্ত তুমি

অবোধ বালক, ঘুমা রে তুই ঘুমা
রাত বারোটা, অন্ধকারে নামছে সেপাই
লাল বেয়োনেট বুকের ওপর সমর্পিত
তোর কপালে মা যশোদা
পরিয়ে দিলেন অশ্রু এবং রক্তচাঁদের চুমা।

বেণু দত্তরায়

অনেকদিন বাড়ি যাইনি

অনেকদিন বাড়ি যাইনি। অনেকদিন
বাড়ি যাব বলে কথা ছিল। কিন্তু
যাওয়া হয়নি। তুমি
বাড়ির ঠিকানা কি ক'রে পেলে? বাড়ির
সামনে বাগান, ফুলের ফলের
গোলাবাড়ির ভিতরে—
যত্নে উৎসবের গান নিয়ে এলে,
শঙ্খমঞ্জরীতে প্রাণের আহ্বান। অনেকদিন
যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি।

যেতে-যেতে নদীর ভিতরে দেখা, স্বপ্নের
ভিতরে দেখা, নৌকোর
গলুই ছুঁলে জলের অদ্ভুত গন্ধ—
ছিমছাম ঘাসের শরীর অন্যমনে

তুমি কি ক'রে ঠিকানা পেলে, বাড়ির
ঠিকানা পেলে? যত্নে
উৎসবের গান নিয়ে এলে

আমি বাড়ি গেলে ঠাকুমাকে
পাবো? শিশিমায় আচার বয়ম
আমাকে খুঁজবে কি? পাকা
গাবের গন্ধে রাত্রি ভোর হবে কি?

তুমি কি ক'রে পেলে? ঠিকানা পেলে?

করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য

শেখ মুজিবর

আমাদের বিবেক মাটি চাপা পড়ে
অরণ্যে ভূগর্ভ জুড়ে কয়লা জমে ছিল।

খনিঃ পাতালে বুকেঃ উদ্ভিন্ন হীরা
আছে জানতাম, কেউ তবু পারিনি ছুঁতে।

অমল কব্জির জোরে দুই হাতে তুমি তুলে নিলে,
হীরার বিভায় : শ্যামলার কয়লায় : বাংলা ভাষায়
বাঙালী সূর্যমুখী পূর্বের উদ্যানে।

জলের পরাগে : টলমল আশ্চর্য ভূগোল,
ধবল সৌরভে
স্বর্ণিল তোমার প্রচ্ছদ স্বপ্নের বলয়ে
তেজের মঞ্জরী ঊর্মিল শেখ মুজিবর
কয়লার পাতাল ভাঙো
হীরা হাতে হাসো।

শিশিকান্ত মজুমদার

জয় বাংলার মহান নায়ককে

এপার ওপার দুপার বাংলা শহর গঞ্জ গ্রাম
ধ্বনিয়া উঠিছে কেবলি একটি নাম
সে নাম তোমারি নাম—
বাংলা বন্ধু মুজিবর রহমান,
সালাম তোমারে, সালাম, হাজার-সালাম।

মহান নায়ক মুজিবর রহমান
বাঙালি বক্ষে চিরশাশ্বত অভয় মন্ত্র গান

এতকাল ধরে মেঘনা পদ্মা রূপসার কূলে কূলে
গুমরি গুমরি আছড়ে মরেছে কী যন্ত্রণায় ফুলে
আজ তুমি তারে সংহত করি জাগালে সুরের এ কী বিস্ময়
বিশাল জনতা কণ্ঠের কল্লোল
জয় বাংলার ধ্বনিতে মুখর মৌন লক্ষ রক্তশোণিতে জাগলো প্রলয় দোল।

বাঙালির খুনে লাল হয়েছিল ক্লাইভের খঞ্জর
সেই ক্লাইভের বংশধরেরা রচিয়া আপন পথ
দিয়ে গেল শেষ মন্ত্র কুটিল খণ্ডিত হলো দেশ এই দেশ, এই জাতি
এই বিশাল ভারত—
বিরাট বাংলা দেশ
ধর্মের নামে জ্বালালো আগুন আত্মধ্বংসী ষড়যন্ত্রতম
হানাহানি খুন নারকীয় বিদ্বেষ।
তারই ফলে এই সোনার বাংলা কেটে হলো খান খান
এপারে গঙ্গা ওপারে পদ্মা মাঝে ধূ-ধূ করা হাহাকার আর বুক ছেঁড়া ব্যবধান।

তারপর এই দীর্ঘদিনের সকরুণ ইতিহাস
ছেঁড়া পাতা খুলে মেলে ধরে আছে অনেক সর্বনাশ
বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার মিঠে ভাষা
দূষিত বাষ্পে বিষ হয়ে গেল বাঙালির ভালবাসা
ধর্মের নামে ভুয়া সংহতি মাঝে প্রকাণ্ড ফাঁকির সাহারা,
মরীচিকা শুধু মরীচিকা মায়াময়
এতদিন পরে ভ্রান্ত জীবনে সংগ্রামীরূপে দেখা দিল নিয়ে
অঙ্গীকারের দৃঢ়তার প্রত্যয়।
এই দৃঢ়তার এ স্বাধীনতার মূল্য দানিতে লক্ষ অযুত প্রাণ
নিল শপথের রাঙা অক্ষরে অসহযোগের শাণিত অস্ত্রে
জঙ্গীশাসন বিরুদ্ধ অভিযান।
জয় তার জয়—জয় বাংলার জয়
জয় মুজিবর রহমান জয় বাঙালী নায়ক বিশ্বের বিস্ময়।

আবদুল সাত্তার

সাবাস ! সাবাস ! মুজিবর

"বৈশাখের ঝোড়ো হাওয়া ওপার বাঙলায়......"
মাতৃভূমির ঋণ শোধ করে মৃত্যু-মুক্তিপণে
বরেণ্য বাঙালী আজ ; নোয়াখালি ঢাকা চট্টগ্রাম
"বিপ্লবস্পন্দিত বুকে গেয়ে ওঠে......"
উত্তাল ওপার বাঙ্‌লা আঙে নিত্য দুর্গম চড়াই,
রাক্ষসরাজার সাথে আজ ত'র মুক্তির লড়াই
শুরু হ'য়ে গেছে, তাই পথে পথে দুঃসাহসী বীর,
দৃপ্ত পদে আগুয়ান, চূর্ণ করে পাষাণ প্রাচীর ;
মুক্তির আস্বাদ পেয়ে আজ তারা রুদ্ধকারা ভেদি,
দুপায়ে গুঁড়িয়ে দেবে শিকলদেবীর পূজাবেদী ;
"জয় বাঙ্‌লা" মন্ত্র বুকে লক্ষ লক্ষ অসুরের বল
সঞ্চারিত করে তাই দুঃশাসনী কঠিন শৃঙ্খল
থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ; গর্জে ওঠে শহর বন্দর,
ও আমার ব্যবচ্ছিন্ন ওপার বাঙ্‌লার সহোদর
পদ্মায় জোয়ার এলে আজো তার ক্ষুব্ধ কলধ্বনি
জাগে বুকে কাঁদে যেন অসহায় বন্দিনী জননী
শয়তানের কূটচক্রে আজো বক্ষে বিঁধে আছে তার,
যোজন যোজনব্যাপী শুধু তীক্ষ্ণফলা কাঁটাতার ;
রক্ত ঝরে নিশিদিন, হু হু ক'রে মা আমার কাঁদে,
সার্দ্ধসপ্তকোটীকণ্ঠ কলকলভীষণনিনাদে
আজ তার মুক্তিপ্রার্থী ; "জয় বাঙলা" অজর অমর,
সাবাস ! সাবাস ! বীর, বঙ্গকেশরী মুজিবর !

মৃণালকান্তি কাজী

আমরাও জেগে আছি

ওপারেতে ঘুম ভেঙেছে, এখানেও অতন্দ্র আছি।
রাজনীতিকের কুটিল ছুরি হৃদয়কে ভাগ করতে পারে?
বুকের ওপর কান পাতলে সবাই যে খুব কাছাকাছি;
একই তো সুর আমাদের মনের সেতারে।
দুই প্রান্তের একই গান—
জয় বাংলা, জয় মুজিবর রহমান!

জঙ্গী প্রভুর বেয়নেটের চকচকে আয়নায়
মুষ্টিবদ্ধ লক্ষ হাতের ছায়া,
রক্ত সাগর সাঁতার দিয়ে লক্ষ মানুষ যায়।
দীপ্ত ভোরে সতেজ দিনের মায়া।
পাশাপাশি এগিয়ে চলে হিন্দু-মুসলমান—
জয় বাংলা, জয় মুজিবর রহমান!

পুব আকাশে সূর্য ওঠে, ওখান থেকেই এলো
সোনালী রোদ বুকের জানলা দিয়ে
আকাঙ্ক্ষার নিবিড় ঘরে। সময় এলোমেলো।
এপার বাংলা ওপার বাংলা জাগে শপথ নিয়ে।
দুই প্রান্তের একই প্রাণ—
জয় বাংলা, জয় মুজিবর রহমান!

সত্য গুহ

রক্তাপ্লুত রূপসী বাংলা দেশ

আমারে তোমার বুকে টেনে লও মাতা
আমি হিন্দু না—আমি না মোছলমান
যাবজ্জীবন কারাবাসসহ সাজা
দেশান্তরের খাঁটি নিষ্পাপ প্রাণ

যে ছিলো একদা নওল কিশোর গাঁয়ে
ফেলেছিলো আলো লক্ষীর শাঁখা ভরে
ভাখো—হায় ভাখো, টিকে আছি কোন দায়ে
ফণিমনসার মতন গরাদ ধরে

বালাম ধানের দুধের গন্ধ মুখে
ভাখো—ভুঁকে ভাখো, হায়রে শরীরে আঁকা
ঘাসে জলে তাজা রূপসী বাংলা, বুকে
কীর্তনখোলা বহে যায় স্মৃতি মাখা

চাল ধোয়া জলে পলি পড়ে পড়ে ভাসে
ধানের শানের পরণ-কথার মাটি
বুকের ভেতরে, হায়, দূর পরবাসে
তাবার ভেতর দিয়ে গিয়ে দেখি ছুটি

আপাদ মাথার হাজার নদীর ধারে
বোরখা আড়াল পশুর উপনিবেশ
নারী দেহ, আহা, তেমন বলাৎকারে
রক্তাপ্লুত রূপসী বাংলা দেশ ।

শিশির ভট্টাচার্য

আবার ঘুরছে ইতিহাস

সময়

রক্তের

ক্রমে

আলোড়িত মুখর দামামা।

আচম্বিতে ফুঁসে ওঠে ঢেউ,

যেন কেউ

প্রচণ্ড তুফানে যুঝে যুঝে

হেঁকে ওঠে,

—সামাল সামাল

ভাই সব, দামাল ঝড়ের ঝুঁটি ধরে

ডিঙিখানা নিপুণ ভেড়াও।

সময়

আদিম

মাহে

উচ্চারিত অবর্ণ যন্ত্রণা।

দীর্ঘবাহু অবক্ষয় রাত,

অকস্মাৎ

ঘুমে ঢোলা যাত্রী শেষ ট্রেনে

চমকে জাগে,

—কোথায় এলাম

অতর্কিতে গেলাম ছাড়িয়ে

স্মৃতির স্টেশনগুলো ফেলে।

সময়

পাহাড়

থেকে

পিছু ডেকে অন্তরীক্ষে ঘোর
বিস্ফোরণে ভাঙছে ভূগোল,

কল্লোল

মধ্যযামে গনগনে লাল
সম্ভাবনা

ছুঁয়েছে আকাশ

রুদ্ধশ্বাস মূঢ় বুক জুড়ে
নিহত জ্যোৎস্নার শবগুলি।

সময়

দেয়ালে

লেখে

উদ্যত মশাল হাতে যেন
অর্বাচীন নড়বড়ে সাঁকো

দূরে রাখো,

বিস্ফোরণে টল্‌ছে সব মাটি
সামাল

সামাল হুঁশিয়ার

আবার ঘুরছে ইতিহাস
যুগান্তের শব্দভেদী বাণে।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রক্ত-তীর্থের গণদেবতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
তোমায় শতকোটি প্রণাম
আমি বাঙালী গঙ্গার এপারে
তুমি বাঙালী পদ্মার ওপারে
তাতে কি ?

আমাদের তো একই আত্মা
একই ভাষা বাংলা ভাষা
একই সাথে গাই বাঙলার জয় গান
ওড়াই আকাশে বাঙলার জয় নিশান।

হে মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা
দু'যুগ পরে শোষকের কারান্তরে
কোন যাদু মন্ত্রে জাগালে শোষিত বাঙালীকে ?

তুমি বাঙালী
আমি বাঙালী
হিন্দু না মুসলমান না
শুধু বাঙালী
এক জাতি এক প্রাণ একতা
তাই গেয়ে যাই জয় বাঙলার গান
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে প্রাণে প্রাণ।

বাঙলার সবুজ মাটিতে
আকাশে বাতাসে
আজ ধ্বনিত হচ্ছে
সবুজ প্রাণের যে উদ্দীপনা

শাসকের রক্ত আঁখি
পারবে না রুখতে তারে
হাজার রাইফেল ছুঁড়ে
ভেসে যাবে তারা পদ্মার ঢেউয়ে।

হাত বাড়াও বন্ধু ওপার হতে
আমরাও তো বাড়ায়েছি হাত
মিলন সেতু হোক রচিত
দুই বাঙলার প্রাণে।

শিশিরকুমার দাশ

বাংলা দেশ

জননী গুণ্ঠন খোল : আজ তোর লক্ষ লক্ষ ছেলে
সমুদ্রবেলায়, বনে, সন্দীপের চরে
কুষ্টিয়া ঢাকায় যশোহরে
গ্রামে গঞ্জে পথে হাটে শহরে বন্দরে
তোর মুখ দেখতে চায়, অন্ধকারে বিদ্যুতের মৃত্যু-দীপ জেলে,
শরীরে মশাল জ্বলে
সমস্ত দিগন্ত জোড়া বন্দনা-উদ্দীপ্ত দাবানল
রক্তস্রোতে লাল পদ্মা রূপসার মেঘনার জল
নক্ষত্রের হীন-দীপ্তি তলে
বহ্নির বিহ্বল শিখা জাগে চট্টগ্রামে
জননী তোমারই নামে!

আজ তোর লক্ষ লক্ষ সোনার সন্তান
দুর্গের দুয়ারে জাগে, উচ্চকিত এককণ্ঠ অনন্ত সুদূর

দিকে দিকে দস্যুদের পৈশাচী কামান
কামার্ত পশুর মত আর্তনাদে ছুটে আজ আসে
সুবিস্তীর্ণ বাংলার স্বাধীন আকাশে
মাঠে ঘাসে, ঘরে ঘরে তোমার বিপন্ন অন্তপুর
নরঘাতী বারুদের বিস্তারিত লালসার ফণা—
তবু শোন সন্তানের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা
আতঙ্কে কুঞ্চিত হয় ক্ষুধার্ত নখর যত নির্লজ্জ পশুর ;
সন্তানে সংগীত গায়, আমরা প্রাণের বন্ধু, আমরা গানের বন্ধু, আমরা মৃত্যুর —

আজ তোর লক্ষ লক্ষ বুকের সন্তান
শুয়ে আছে মাঠে মাঠে ঘাসের ওপর
পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, ভেঙে যায় , চোখে স্থির প্রত্যয়ের রেখা
পৃষ্ঠে নেই অস্ত্রলেখা
ক্ষত বক্ষস্থল শুধু শত্রুপ্রহরণে
শুয়ে আছ নদীতীরে, অন্ধকার, নিঃসঙ্গ শীতল
স্তব্ধ স্থির নক্ষত্রের দল
নীচে শুধু অগ্নি বহঙ্গের তীব্র ডানার উচ্ছ্বাস
বিস্ফারিত দিকরেখা, মৃতদের উত্তাল গর্জনে
নিঃশব্দ তবুও তীব্র, কম্পমান বাংলার আকাশ
বৈশাখের রুদ্র মেঘ ছুটে আসে ক্ষুব্ধ মত্ততায়
মৃতেরা দাঁড়ায় উঠে, জানায় আহ্বান
জননী গুণ্ঠন তোর উড়ে যায়
মুখ দেখ সন্তানের বীরের শয্যায় ॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মুজিবর রহমান

পেটটা মোটা ভুঁড়িবাগানো বুনো বাদুড়
শূন্যে থেকে ঝট্‌পটিয়ে বাজায় ডানা,
পাড়া কাঁপায়, তরুশাখায় রাত-দুপুর
চরে বেড়ায়, ভয় দেখায় জানা-অজানা।

ঠোঁট-ঠুক্‌রে ছোরা চালায় সুবিধে পেলে
সঙ্গে আনে ঝুট-ঝামেলা রাত্রি কালো,
শেয়াল-শকুন রক্তচোষা হায়না ঠেলে
জানোয়ারের আসরটাকে ঝল্‌মলালো।

সবুজ জমি শ্মশান করে, মাংস-হাড়
গড়াগড়ি, বাঙলায় কি রক্ত খায়!
ভূত-প্রেতের নৃত্যভূমি—শব পাহাড়
ইতস্তত বিলেল্লামি উঁচু গলায়।

হঠাৎ কে-সে ভ্রূকুটি করে—কাঁপন লাগা?
লৌহদৃঢ় কঠিন মন, কোমল শাঁখ-
কণ্ঠে ফের ভরসা দেয়—নিদ্রা-জাগা
জনগণকে চড়া-নেশার কড়া-তামাক।

হাতুড়ি মেরে মরা-মনকে জোর মদৎ
কে যোগায়? ঊর্ধ্বে তুলে কালো-পতাকা
শ্লোগান ছাড়ে: চাই একক স্বাধীন পথ,
স্বায়ত্তশাসন, বাণিজ্য বা বাঙলা টাকা।

কোটি কণ্ঠ নিনাদিত সবার প্রিয়
দেশ-নায়ক সে মুজিবর রহমান,
অবিচলিত অভিসরণ—লক্ষ্যণীয়,
সেলাম করি—তিনিই দেশের সুসন্তান।

কবিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ আজ খুব কাছে

মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আজ খুব কাছে
কোটি কণ্ঠে 'জয় বাংলা' লাল অভিজ্ঞতা হয়ে আছে
মনে হচ্ছে পলটন ময়দান খুব কাছে।
হস্তামলকীব, বস্তুত ভূগোল
আমাদের করধৃত।

মানুষে মানুষে কিন্তু দুস্তর প্রবাসী
চতুর্দিকে অনাত্মীয় সমুদ্র কল্লোল।

কদাচিৎ শোনা যায় এ-রকম ঘরে-ফেরা বাঁশি!

আমার সৌভাগ্যগুণে
নাজমা আখতারের কণ্ঠে সেই বাঁশি শুনে
হে বাংলা, আমার বাংলা বারে বারে বারে
হে পরম প্রিয়
—এই ডাক এপারে ওপারে

মনে হচ্ছে দুই বাংলা বাংলার আত্মীয়
মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আজ খুব কাছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশ

মেঘলা রাতের মেঘনা আমার
গভীর রাতের ঘূর্ণিঝড়,
ঝড়ের সাঁঝের কর্ণফুলি
ঝাপট দেওয়া নীলসাগর—

তোমার পায়ে মনকে আমার বেঁধে দিলাম নূপুর
নটরাজের নতুন নাচের বোল সে এখন ধরতে থাকুক।
তোমার হাতে দুচোখ আমার রেখে দিলাম মুকুর
বৈশাখী ওই চুলের ছায়া তাতে এখন পড়তে থাকুক।

শুকনো পাতা, পাতার মতোই উড়তে চাই
ওই আগুনের সঙ্গী হয়ে পুড়তে চাই।
বাঁচার রাস্তা কোথায় পাবো নেইক জানা—
তুমি হঠাৎ পাঠিয়ে দিলে
কেমন করে মরতে হবে তার ঠিকানা॥

নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণাম জানাই

শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার দু'হাতে ঠেলে
পূর্ব দিগন্তে নব—সূর্যোদয়।
হে সূর্যসারথি, আগামী দিনের অগ্রদূত,—
আকাশ, মাটি, জল—বাংলার প্রত্যেকটি ধূলিকণা
আজ তোমার পবিত্র স্পর্শে ধন্য,—'বঙ্গবন্ধু' তুমি।
পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে-ধ্বনিত তোমার জীবনমুক্তির উদাত্ত আহ্বান
এপারে গঙ্গার কুলুকুলু প্রবাহে প্রতিধ্বনিত।
আমি শুনেছি, বন্ধু—শুনেছি ওপার-বাংলার সাত কোটি
ভাইবোনের সম্মিলিত কণ্ঠের সুমহান 'জয় বাংলা'—ধ্বনি।
ওরা চলে, এগিয়ে চলে মাতৃমুক্তির দুর্বার আকর্ষণে:
কত গ্রাম, নদী পর্বত— কত চড়াই-উৎরাই, মহামারী মন্বন্তর পার হয়ে,
সে শুধু তোমারই নামে, বন্ধু—তোমারই প্রেমে!

পূর্ব দিগন্তে নব-সূর্যোদয়:
বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলার নব ইতিহাস শুরু,
সে-ইতিহাস রচিত হবে লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী 'নরনারীর
রক্তের আখরে।

আজকের এই ধ্বংস স্তূপের ওপরেই গড়ে উঠবে জাতির ভবিষ্যৎ,
নবীন আশার উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে এ-পৃথিবী ;
উন্মত্ত, হিংস্র পশুরা তখন লজ্জায় আত্মগোপন করবে নির্জন গুহা-গহ্বরে !
হে ইতিহাসের প্রাণপুরুষ,—
যুগ-সন্ধিক্ষণের এই পরম লগ্নে
তোমাকে জানাই আমার ব্যথিত চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম ।

জগৎ লাহা

ঘরে ফেরা

সমুদ্রে দুরন্ত ঝড় কালনাগিনীর ফণা—সপ্তডিঙা মধুকর তোবে—
নীলকান্ত মণি রত্ন পান্না হীরা চুনী—আমি ভরাডুবি থেকে বাঁচলাম
দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস মূর্ছিত প্রেতের ছায়া পিছে পিছে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটে—
প্রচণ্ড উত্তাপ দাহ শৈত্য জ্বালা—নিরীশ্বর চাঁদ সদাগর

ওপারে পদ্মার ঘাটে কেউ কী আমার জন্যে প্রতীক্ষায় আছো ?

সম্মিষ্ঠ পৌরুষে দৃপ্ত অহংকারী, স্বকামে নিষ্কম্প্র কেউ বিদ্রোহী বাঙালি
বজ্রমুষ্ঠি ক্ষমাহীন অতন্দ্র জাগর কেউ আমার আরব্ধ পণ অঙ্গীকার করে
আপন ইষ্টকে ছাড়া অন্য কোনো স্বেচ্ছাচারী বিষকুম্ভ ছায়ার মায়াকে
অঞ্জলি আমৃত্যু নয়—পদাঘাত পূর্ণঘটে ছলিত মথিতা কূট সর্পগ চতুর:

জেনে রাখ—অবিভাজ্য, শত্রুঘ্ন বাঙালি আমি শাশ্বতিক পদ্মার গঙ্গার
আমার ভূগোল এক ভাষা এক—সূর্য সুর স্বপ্ন ও সাধনা
আমার মাতৃকামুখ বাংলার নভোতলে আদিগন্ত সবুজে সোনায়
আমার চোখের জল আমার বুকের শ্বাস এপার ও ওপার বাঙলার

দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস অযুত যোজন পথ হেঁটে এসে—ওপারে না সূর্য ওঠে যদি
এপারে সূর্যাস্ত ছায়া—প্রত্যাসন্ন সূর্যোদয় হেঁটমুখ বিভ্রান্ত প্রতীতি—
ফিরে যাব নিরাশ্বাস ?   ব্যর্থ হবে কালান্তর জয়িষ্ণু এষণা
হলাহল বিষমিষা (লখিন্দর !)—বেহুলার দেহদাহ স্বর্গীয় কামার্ত দেবতার ?

ফিরে যাব পুনরপি ভরাডুবি নিঃস্ব বুক নিরীশ্বর চাঁদ সদাগর—
বল না, পদ্মার ঘাটে কেউ কী আমার জন্যে প্রতীক্ষায় নেই ?

অমিত বসু

চলো যাই

যশোর কুমিল্লা ঢাকা
খুলনা থেকে ওরা ডাকে
বীর চট্টগ্রাম
কুষ্টিয়া, রংপুর, রাজশাহী
আজ সবই রোমাঞ্চিত নাম
গঙ্গাতীরে দুঃস্বপ্নের রাত
হঠাৎ বিদ্যুতে চমকায়
রক্তে আজ সাড়া দেয়
উদ্দাম যৌবনা পদ্মা
তরঙ্গ প্লাবন হয়ে ডাকে
চলো যাই
মুজিবের হাতে হাত
বাঙালীর বাঁচার লড়াই ;
এখানে পিচ্ছিল অন্ধকারে
প্রদীপের আত্মহত্যা
সারারাত তিলে তিলে ক্ষয়
ওখানে ময়দানে ভোর
উত্তাল জনতা বলে 'জয়
বাংলার জয়।'

ভূগোলের কপট সীমানা
মানব না,
শুনব না সাবধানী জুজুদের ভয়
মুক্তির সোনার ঘণ্টা
ডাক দেয়—এইত সময় ;

নারায়ণগঞ্জের ঘাটে ফের দেখা হবে
স্টিমারে ইলিশ মাছ ভাত
কিংবা পল্টনের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে,
সন্ধ্যায় রমনার মোড়ে,
কলকাতার গল্প করব, কবে এলে, কাল ?
এবারও বর্ষায় জানো বরিশাল সেই থৈ থৈ
আদরে আপ্যায়নে
চিড়ি নিয়ে নিমন্ত্রণ পাড়ায় পাড়ায় ;
সারারাত শুয়ে শুয়ে শুনব পদ্মার পাড়ভাঙা
এ নাটোরে কবে ছিল বনলতা সেন ?
রাজশাহী সেই রাজশাহী।
ভোলানাথ থেকে লোকনাথ আবার হাঁটবে ওরা
স্কুলের ছুটির পরে
সেই ছিপছিপে স্বপ্নালু খালেক
বাসুদেব সরস্বতী, নকল, সামসুল—
চলো যাই—
যেখানে লড়ছে ওরা কাঁধে কাঁধ রেখে
এ লড়াই বাঁচার লড়াই ;

রণে রক্তে অপমানে
শত্রুকে চিনেছি আজ, বন্ধুকে নিয়েছি বুকে টেনে,
ঢাকায় বা কলকাতায়
জীবনের একই সংগ্রাম
এক ভাষা এক স্বপ্ন
এক দুঃখ নিয়ে বোঝাপড়া,
এক যুদ্ধে সকলে সামিল ;

আসমুদ্র হিমাচল মুখরিত
একই ঘোষণায়—
মূর্খ ইয়াহিয়া খান !

পর্দানের ভয়ে আজ ভুলে গেলে
এ বাংলার মাটি
শহীদের রক্তে লাল,
কোনও জহ্লাদের সাধ্য নেই
এখানে গড়বে তার ঘাঁটি।

উত্তমকুমার দাশ

আমার বাংলা

এপার বাংলায় জ্বলছে আগুন ওপার বাংলা লাল
যোজনব্যাপী বদ্ধ-প্রাচীর রইবে কত কাল?
ঘরের দুয়ার পাষাণচাপা মনের দুয়ার খোলা
অসম্ভবের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে নাগরদোলা।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যিখানে চর
কান্না হাসির দোলায় আমরা বাঁধছি নিজের ঘর,
মুক্ত আকাশ চাঁদ-সুরুজে নিচ্ছে লুটি আঁধার
ভাইয়ের জন্যে মনটা হু হু করছে তোমার আমার।

অঘ্রাণে হলুদ-রোদে ভাসে আমার মাঠ
তোমার ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মী বসায় হাট;
আষাঢ় মাইস্যা বানে জাগে গঙ্গা-পদ্মার ভূত
আমরা মরি ক্ষুধার জ্বালায় তোমার কান্দে পুত।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে শুধু চর
আমরা কাঁপি বজ্রপাতে তোমার ভাঙে ঘর।
সন্দেহ-বিষ পোড়ায় কেবল পরস্পরের বুক
শিব সদাগর আনবে ঘরে ঘুচবে সকল দুখ।

পীযূষ বসু

এপার ওপার ও ইচ্ছের ছায়াপথ

এখানে রোদ্দুর চড়া প্রসাদ নগরী,
ধুলো ধোঁয়া ভরা যান্ত্রিক জীবন,
বাস্ত কলরব ট্রামে বাসে ভীড়,
কাফেতে রেস্তোরাঁয় নিত্যকার হাহাকার,
ক্ষুধা, অবক্ষয় যন্ত্রণার গমক মূর্চ্ছনা।
সরু গলি, সাজান দোকান,
প্রেক্ষাগৃহ, পার্ক ও গীর্জার সহঅবস্থান
মন্দিরের ঘণ্টা শঙ্খ, মসজিদে আজান
বিষণ্ণ সন্ধ্যার মাঝে আলোর আলাপ
বিচিত্র রাতের মাঝে পাগলের স্খলিত প্রলাপ।
এর মাঝে নেমে আসে দিন, কেকের কোণায়
অথবা বিকেল, ময়দানের সবুজ ঘাসেতে
কখনও স্বর্গীয় আমেজে তোলে সুর
গির্জের মিঠেল ঘণ্টা আকাশে বাতাসে।

দু দশকের মতো সেই স্বপ্নের ওপারে
শ্রান্তি ক্লান্তিহরা সব ইচ্ছের প্রহরা
ধানের শিষের পর বাতাসের ঢেউ
নদীর ওপরে নৌকায় মাঝির হৃদয়
বৈঠায় টানের সঙ্গে ভাটিয়ালী সুর
শ্যামলী মালতীলতা সব আনাগোনা
কাঁখেতে কলসভরা চাউনী সুদূর
দাওয়াতে হুঁকোর শব্দ নিস্তব্ধ দুপুর
পিছনে বাঁশের বনে উদ্বেলিত হাওয়ার ইশারা
শশ্রু অলঙ্কৃত মুখে ভাবের না পায় কিনারা
কি নাম তোমার যেন আমি ভুলে গেছি
বালাম চালের ঘ্রাণ আজ যেমন ভুলেছি

একদা আশ্রয় যেরা শ্রান্ত সে জীবন অঙ্গন
অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্ন নির্বাসিতে সে অগ্রহায়ণে
এখনও যাদের ঘিরে সে ইচ্ছেরা ফেরে
তারা কি আবার একান্ত প্রত্যয়ে এসে ঘেরে॥

ওপারে ওদের কণ্ঠে সুতীব্র আওয়াজ
এখানে অনতিক্রম্য ঐ ছায়াপথ আজ॥

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

এ কিসের শোক

এ কিসের শোক! কালো পতাকা কেন!
এখন ত' শোকের সময় নয়, গর্বের সময়—আনন্দের সময়;
আনন্দ লড়াই করার, আনন্দ মাতৃঋণ শোধের।
পশ্চিমের ডালকুত্তাগুলো, মানে না মনের কথা,
বন্দুক আর বেয়নেট উঁচিয়ে দাবিয়ে দিতে চায়—
পূবের সন্তানদের উঁচু মাথা।
রক্তপায়ী খেলোয়াড়দের রক্ত হোলী খেলা,
সাঙ্গ হবে সেনাদের কালের বাঁশীতে,
শিকলের বন্ধনে ওরা থাকতে রাজী নয়।

দূর থেকে আমি শুধু রং খেলা দেখি,
প্রতিক্ষণে ইচ্ছে করে মিশিয়ে দিই লাখো হাত মাঝে,
আমার দু'হাত।
শরিক হয়ে মিশে যাই রক্ত সরণিতে,
দুর্দান্ত আক্রোশে শুধু শূন্যে হাত ছুঁড়ি।

গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওপারের সতেজ চেহারা দেখে।
কোথায় পেল এত বল!
অস্ত্রবল কিছুই ত' নেই—
রক্তলোলুপ হায়েনাকে বশ করার।
আছে শুধু মনোবল আর প্রচণ্ড মানব বল,
যে বলে বলীয়ান হ'য়ে ওরা লড়াই করে—
হয় যুদ্ধে হবে শেষ,
না হয় সকালে দেখবে, সোনায় রাঙানো রঙীন আকাশ।

ওপারের বিদ্রোহী মনের সনে মন মিশে যায়,
ওরা ত' করে না শোক যোদ্ধাদের অকাল মৃত্যুতে,
প্রচণ্ড সাহস নিয়ে লড়াই করে যায়,
এ পারেতে তবে আমি কেন শোক করি!
সৌভ্রাত্রের বন্ধন যদি মানো,
চল না যাই, ওদের পাশে দাঁড়াই।
শোকের কালো পতাকা না তুলে,
রাঙানো মনে ওদের পাশে যাই,
অস্ত্রবল না থাকে না থাক,
মনের বল কেউ পারে না কেড়ে নিতে,
বিভাবের রণনীতি ছেড়ে,
প্রীতিমাখা কণ্ঠে গাই—আমরা দুটি ভাই।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাংলা, আমার বাংলা

[কবিতা একটিই ; তিনটি নিয়ে একটি। দুরূহ সামরিকের আবর্তে, অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়ে দুবছর আগে এর প্রথম অংশ যখন লিখেছিলাম তখন বুঝতে পারিনি দ্বিতীয় অংশ এত তাড়াতাড়ি লিখতে পারব। বাস্তব-বিচারে তৃতীয় অংশটি এখনো ভবিষ্যের গর্ভে, তবু অনাগত হলেও যা অবশ্যম্ভাবী, সুনিশ্চিত, ধ্রুব—তাকে স্বাগত জানালাম আমার চেতনায় অধিবাসনায়, প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষতায়। তাছাড়া অনাগতকে রূপদান করাই তো যথার্থ কবিকৃত্য।]

আমার দুচোখে আজো হিরণ্ময় সেই বাংলা দেশ
সে অমল শ্বেত পদ্ম, চন্দন গন্ধ, স্বপ্নদ্যুতি, সূর্য প্রতিমা।
ইতিহাস নিরুত্তর। এবং এ বিপরীত সময়ের
সব নির্বিশেষ
দ্বিধাদ্বন্দ্ব পার হয়ে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নির্নিমেষ
অন্ধকার তবু সে আমার আশ্চর্য দিগ্বিতিমা :
হৃদয়ে হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠার অনিন্দ্য আনন্দ অশেষ
হয়ে আছে। এখনও দুচোখে তার শান্ত বরাভয়, নীলাকাশ,
শস্য শ্যামল ভূমি, বহতা মুগ্ধ নদী,
আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর,
গ্রাম গৃহ লোকালয়, জনাকীর্ণ হাট, গঞ্জ
প্রিয় অবকাশ
এই সব মনে পড়ে। যদি চ এখন চারিদিকে ঝড়—
উত্তপ্ত বালুর প্রহর
পরিব্যাপ্ত, আমাদের গ্রাস করছে নষ্ট অন্ধকার।

তবু জানি দিগ্বিতিমা চোখ মেললে আবার এখানে নদী,
আলোর বিভাস
নেমে আসবে, আবার ফলন্ত মাঠে হলুদ অঘ্রাণ

খেলা করবে, ফুল ফুটবে বৃক্ষে, পরবে আবার
মুকুলিত স্বচ্ছ দিন, কলনম্র বৃক্ষের উদ্যান
চারিদিকে পরিপাটি।
দিস্তুতিমা চোখ তুললে সমস্ত দুয়ার
খুলে যাবে: তখন আকার সেই অখণ্ড শুদ্ধ প্রতিভার
কাছে আমরা সমবেত নতজানু:

জীবনে জীবন যোগ করার আশ্চর্য অভিজ্ঞান
কখনো যে কথা বলছে আমাদের রক্তের গভীরে,
চোখ বুজলে দেখতে পারি—এই রূপনারায়ণের তীরে
গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রে প্রসারিত আমার সে সন্ন্যাস প্রতিমা
কালজয়ী:
কথা বলো, কথা বলো তুমি দিস্তুতিমা!
আমাদের শুদ্ধ রক্তে সমবেত, বোধেও ব্যথায় তুমি
পুনর্বার অকাল বোধনে
আবির্ভূত হও, তুমি ছিন্নভিন্ন ভূগোলের বন্ধন ছাড়িয়ে
চৈতন্য সাগর তীরে অনাহত জীবনের গান হয়ে ওঠো।
আমরা পারি না আর। ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছি,
সময়ের দুঃসহ দহনে
দগ্ধ ভ্রষ্ট। তোমার আকাশ ছুঁয়ে জীবনের সমস্ত
সূর্যাস্ত মাড়িয়ে
আবার আমরা নিয়ে আসতে পারি দুর্জয়
সম্পন্ন সকাল, তুমি ফোটো
শ্বেত পদ্ম ওঁ ঋং ঋতং রূপায়ত স্বপ্ন আমার।
স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এস এ মাটিতে। রক্তাক্ত এপার ওপার
আবার একসঙ্গে সমবেত হোক, হবে জানি—
তুমি যদি রয়েছ আমার,
আমাদের। সবাই আসছি আমরা, খুলে রেখ
রাত্রির দুয়ার।
তোমার আশ্চর্য নামে শ্বেত পদ্ম ফুটবে আবার,

শ্বেতপদ্ম হব আমরা থরোথরো দুর্জয় সম্পন্ন দুর্বার
সূর্যের আকাশ ছুঁয়ে উদ্ধত অখণ্ড বাংলা
আরণ্যক প্রতিভায় পূর্ণায়ত হবে
অবিরাম আলোকে উৎসবে :
সময়ের অন্তরালে আজো সেই মুগ্ধ অহংকার
স্পষ্টতঃ জানি না, তবু ঠিক বেঁচে আছে :
বাংলা বাংলা প্রধ্বনিত আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে
আমরা জানি না তবু অন্য এক অভিমানী মন
আমাদের জেগে আছে—
রাত্রির তমসা ছুঁয়ে বুঝি অনুক্ষণ ॥

সে যে আসে আসে আসে

মুজিবর—সে তো কোনো মানুষের নাম মাত্র নয় ।
আমাদের আকাঙ্ক্ষার অমর প্রতিমূর্তি
সুগন্ধ, আলোর ধ্যান শাশ্বত বাঙালীর হৃদয়-পদ্মের :
মনুষ্যত্ববোধে দীপ্ত নতুন জীবন রচনার
দুর্জয় সম্পন্ন অঙ্গীকার ।—সমস্ত সূর্যের বিস্ময়,
সমস্ত সমুদ্র ইচ্ছা, মাটির মমতা যত, মেঘের বিনম্র
আর আগ্নের আনন্দ হৃদয়ের
হে বাঙালী, ঐ নামে উৎসর্গিত কর । এসেছে সময়
কালবৈশাখীর দৃপ্ত জাগরণ চেয়ে ছাখো, উদাত্ত এ মহাজীবনের
মুক্ত ছন্দে পা মেলাও, সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রাণনায়
পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দাও । অন্য পথ নেই জেনো জীবন জয়ের ।

প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য নয় । মাথা উঁচু কেবল সে চলতে চেয়েছে
মাটির মায়ের বুকে মানুষের মত,
চেয়েছে সুস্থ স্বচ্ছ সুনীল আকাশ,
সহজ নিঃশ্বাস নিতে—জীবনের স্বচ্ছন্দ বাতাস ।
লোভ আর ষড়যন্ত্র তা থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে ।
বাঙালী পদপাত মনুষ্যত্ববোধের প্রাঙ্গণে চলে গেছে
চিরকাল, ইতিহাস জানে, তার সমস্ত স্বপ্ন ও সাধনা

সাধ্যাতীত সমস্ত তপস্যা ও প্রাণের প্রেরণা
মানুষের জন্য এক সার্বজন্য সুধার সন্ধান।
ভয়ের ভ্রূকুটি তবু বারবার ঘিরেছে তাহাকে
শাসনে শোষণে বারবার নির্লজ্জ বিদেশী কারবার :
সঙ্ঘবদ্ধ শয়তানের উদ্ধত অস্ত্রের ঝনঝনা
হিংস্রতম অন্ধকার : সমস্ত বেইমান নিমকহারাম
বিপক্ষে তুলেছে মাথা!

তবু এ অপরাজেয় স্পর্ধ সত্তাকে
রুদ্ধ করতে পারেনি কেউ। তবু শান্ত হয়নি যে
অশান্ত এ বঙ্গোপসাগরের ঢেউ।

আলোর উজ্জ্বল খড়্গে রাত্রির নিবিড় মহিষে
ছিন্নভিন্ন করে তবু এনেছে সে বার বার নতুন প্রভাত
সূর্যের সোনালী পদ্ম হাতে হাতে প্রতি মুক্ত গৃহের প্রাঙ্গনে।

পদ্মার প্রমত্ত ঢেউ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল উত্থানে মিলেমিশে
বজ্রে ও বিদ্যুতে আজ জেগেছে সে তাই বুঝি :
সঙ্ঘবদ্ধ বাঙালীর উদ্বেলিত কোটী কোটী হাত
আবার নতুন করে অন্য এক ইতিহাস রচনার দায়িত্বে মুখর : প্রাণপণে
সরাতেছে স্তূপীকৃত এ পথের আবর্জ জঞ্জাল
নব পান্থকের বসবাসযোগ্য করে যেতে গাঙ্গেয় বসুধা।
তাই তার গরুড়ের মত এই মহত্তম হিরণ্ময় ক্ষুধা
আত্মার প্রতিষ্ঠা দিতে, বাঙালীর হৃদয়কে ভরে দিতে সুন্দর সঙ্গীতে
আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত এত আয়োজন : বঙ্গোপসাগরের

উদ্দাম তরঙ্গ উত্তাল
ভেঙে পড়ছে অবিরাম—কোটি কণ্ঠে একই নাম একই প্রতিশ্রুতি
মুজিবর, মুজিবর বাঙালীর হৃদয়ের হীরকাগ্নিদ্যুতি
'অনির্বাণ' জ্বলে উঠছে—এ প্রমত্ত তামসী আকাশে
কী জয়ের উদাত্ত উল্লাসে সব প্রমুক্ত সরণি!
ওরে তোরা এখনো কি শুনতে পাস না, শুনিসনি পদপাত ধ্বনি
সে যে আসে—আসে—আসে।

রাজার রাজা

মুজিব ভাই, বন্ধু আমার, রাজা আমার
বাংলা দেশের বুকের পদ্ম—রক্তপদ্ম
এখন তোমার শুভ্র হাতে যেমন প্রস্ফুটিত
হয়ে উঠছে আবার।
বুকের রক্ত ঝরিয়ে তুমি এই তো সদ্য
ফোটালে লাল গোলাপ
তুলে দিলে মায়ের পায়ে, সর্ব-সমর্পিত
নিজেকেও, যা আছে সব প্রশ্নহীন
ভালোবাসায় জয়ে।
বাংলা দেশের কণ্ঠে আজ সূর্য-সংলাপ।
রাম-রহিমের সবার আকাঙ্ক্ষিত
আনন্দরূপ এখন তুমি : অনেক অনেক আত্মত্যাগে
কোজাগরী রাত্রি বিনিময়ে
মৃতের বুকে এনে দিলে প্রাণের উত্তাপ।
সপ্তদশ অশ্বারোহীর কলঙ্কিত অন্ধকারের ইতিবৃত্ত
রক্ত দিয়ে মুছে দিলে পলাশী প্রান্তরের যত পাপ।
বাংলা দেশ জুড়ে এখন দুর্বিনীত ঝড়।
প্রতি বুকের মধ্যে এখন বঙ্গোপসাগর
ছলাৎছল জেগে উঠছে। নিজের মুখের দিকে
নিজের প্রতিকৃতির দিকে এখন আমরা
তাকিয়ে আছি বিস্ময়ে সম্ভ্রমে!
সবার মুখের—সবার বুকের প্রতিনিধি এখন তুমি
সবার পূজ্য—রাজার রাজা।

অলৌকিক তোমার দর্পণে
তোমার তপস্যায়
দেখেছি যে আমরা সবাই আত্মজয়ের মুখ :
সূর্য সমুৎসুখ!

কণ্ঠে তোমার উচ্চারিত আমার বুকের ভাষা
সবার ইচ্ছা মুক্তি খোঁজে তোমার আকাঙ্ক্ষায়,
তোমার প্রতি পদক্ষেপে, আমার বুকের ভালোবাসা
তুমি তাকে করেছ উন্মুখ
আমার মায়ের—দুঃস্থ মুখের দিকে—
শেকল-ভাঙা স্বপ্ন এখন স্বাধীন।
আমার সব হারিয়ে যাওয়া দিন
তুমি তাকে উন্মোচিত করে দিলে: যেন বিশ্বরূপ
তোমার রূপে উদ্ভাসিত: বিশ্বরূপে তোমার প্রতি রূপ।
মন্ত্ররবে উদ্দীপিত বাংলা দেশের সুপ্ত ইতিহাস
তোমার হাতে জেগে উঠল আবার:
বুকের মধ্যে ফিরিয়ে দিলে ভোরের বিশ্বাস।
সবার বুকে প্রতিশ্রুত স্বপ্ন-স্বাধীনতার
গর্জে উঠছে, সবার রক্তে উদ্বেলিত প্রমত্ত পদ্মার
কলধ্বনি ভেঙে পড়ছে—দুরন্ত দুর্বার।
প্রতি বুকের মধ্যে—এখন স্বপ্ন-কোজাগর
মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত সোনার বাংলার!
মুজিব ভাই, বন্ধু, গুরু তোমায় নমস্কার।

তোমার মধ্যে এখন আমার নবজন্ম নতুন অঙ্গীকারে
কাঁপছে ছাখো থরো থরো ভোরের প্রভাতে।
তোমার দিকে তাকিয়ে আছি অবাক বিস্ময়ে
রাজা আমার, এখন তোমার একটি উচ্চারে
ছাখো' আমরা, কেমন স্থায়ী সমবেত
ভালোবাসায় বৃহৎ অঙ্গীকারে।
স্বৈরচারী—গোষ্ঠী—মাতাল দানব যত
শয়তানের আসন যাচ্ছে টলে।
তোমার প্রতিবাদী স্রোতে প্রমত্ত কল্লোলে
ভেসে যাচ্ছে উদ্ধত ঐ পিণ্ডির ফরমান।
বিদেশী দুশমনের পাঞ্জা যেমন করে যুগে যুগে
ভেসে গেছে গঙ্গা-পদ্মা-জলে।

এমন ভালোবাসায় ব্যথা জাগিয়ে দিলে বুকের মধ্যে,
দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিলে
আত্মজয়ের এমন অভিমান
আত্ম-আবিষ্কারের মন্ত্র—
প্রলয় পয়োধি জলে অশান্ত উত্থান—
প্রতিষ্ঠিত এখন তুমি কোটি বুকের স্বর্ণ সিংহাসনে
ওরে তোরা বাদ্য বাজা, গা তোরা সব
অভিষেকের গান।
দেহ-মনের সর্ব সমর্পণে
এনেছে যে সবার জন্য সত্তা স্বাধীনতা
সেই রাজা আজ এসেছে রে! দে তাকে তোর
যা আছে সব দান:
রক্ত দে তোর—হৃদয়ের দে তোর ভক্তি দে তোর
দে তাকে তোর আনন্দ, অহংতা॥

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(রোশনারা বেগমের উদ্দেশে)

তাঁকে

ভারত ভাগ্যবিধাতা,
অন্ততঃ আজকের এই সন্ধ্যাটা
তোমার মেয়েদের সাজতে-গুজতে বারণ কর।
ওরা কি জানে না
ওদের বোনটা মারা গেছে?
অথচ কত আর দূর
গড়িয়াহাট থেকে?
—আশি, নব্বই, একশ মাইল হোক।

এখানে এখন মুজিবুর মাঈ কী জিন্দাবাদ।

ভারত ভাগ্যবিধাতা,
সীমান্তে তোমায় কেউ আটকাবে না—
এসো ওদের সঙ্গে
চুপি চুপি ঐ মরা মেয়েটার পাশে বসো।
দোহাই—
তোমার হিসেবটা একবার শুধরে নাও।

সুশীলকুমার গুপ্ত

এ বাঙলা আশ্চর্য বাঙলা

দেখ, দেখে যাও—
কি ক'রে মাঠের ভিজে নিরীহ ফসল
হঠাৎ আগুন হ'য়ে যায়,
শীতার্ত নদীরা সব ছুঁড়ে ফেলে ঘুম
ফণা তোলে প্রচণ্ড আক্রোশে,
কুঁজো গাছ শিরদাঁড়া টান টান ক'রে
একত্রে দাঁড়ায় বর্গী কুটিল ঝড়ের মুখোমুখী।
পাহাড় শিবির হয়, ভীত পথঘাট
বিদ্যুতের মতো জ্বলে রক্তে ক'রে স্নান ;
প্রতিটি ভিতের গর্তে, প্রাচীরের ফাঁকে
অতন্দ্র চোখের ফেরি, গোলা চালাঘর
বারুদের স্তূপ হ'য়ে অজস্র শিখায়
ফেটে পড়ে অবাক আকাশে।
শহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামে
প্রত্যেক হৃদয় আজ স্বাধীন সচ্ছল বসন্তের
জন্ম দিতে এক সঙ্গে সর্বস্ব শপথে
নিরন্তর উদ্বেলিত।

দেখ, দেখে যাও—
এ বাঙলা আশ্চর্য বাঙলা যে বিধ্বস্ত হ'য়েও হারে না,
যে অনন্ত স্বপ্ন-প্রেমে এক সত্তা, একই ইতিহাস।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯৭১)

বাংলাদেশের ডাক

১

যে-মায়ের ডাক শোনে সারা বাংলাদেশ, আর বঙ্গোপসাগর,
দেশবাসীর প্রিয় সে যে অজেয় নির্ভীক নেতা শেখ মুজিবর।
সাড়ে সাত কোটি প্রাণ অনুগামী তার
লৌহদৃঢ় মনোবল, অটল প্রতিজ্ঞা, বুকে সাহস দুর্বার
নিয়ে জেগেছে মরণ পণ যুদ্ধে, চাই স্বাধীনতা সোনার বাংলার।

বর্বর পশ্চিমী শত্রু আততায়ীদের কাছে পাওয়া বোমার পাল্লায়,
আর, কামান বিমান ট্যাঙ্ক রাইফেলের গোলায়,
লুঠেরা চেঙ্গিস কিংবা তৈমুরের মতো
নির্বিচারে গণহত্যা, নারীর ধর্ষণ, ধ্বংস লুটপাটে নিরত ;
বাংলার শহর গ্রাম করেছে শ্মশান মরুময়।
নিরস্ত্র নির্ভীক মুক্তি যোদ্ধাদের রক্তে নদী বয় ;
তবু তারা প্রিয় নেতা মুজিবের আদেশে উদ্দাম,
শত্রুকে ঘায়েল করে দিকে দিকে প্রাণপণে চালায় সংগ্রাম।
গৃহস্থ ঘরের বৌ যেন লক্ষ্মীবাঈ কিংবা চাঁদ সুলতানা
বীর্যবতী, রাইফেল ধরেছে হাতে, বাধা দিতে হানা।

বীর মুক্তি ফৌজ জানে, সোনার বাংলায় আর নয়
কুচক্রী বিদেশীদের আধিপত্য, আনবে তারা বাঙালীর জয়
যে-কোনো মূল্যেই ; দেবে তারা সংখ্যাহীন প্রাণ বলিদান ;
বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটি, সে যে মায়ের সমান !
ভয় নেই, পাশে আছে বীর নেতা শেখ মুজিবর,
আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রতিজ্ঞা দুর্মর।

২

ওপার বাংলা তো, আজ, সে-অতন্দ্র—
সোনার বাংলারই—জাগ্রত অর্ধাঙ্গ।
তাই
ওপার বাংলার নরনারী কতো প্রিয়
এপার বাংলার, ওরা আত্মার আত্মীয়
সহোদরা, সহোদর ভাই।
পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী
তিস্তা আর যমুনা আত্রাই,
ভৈরব, কর্ণফুলী, মধুমতী, কপোতাক্ষী ফেনী,
অখণ্ড বাংলারই প্রাণ, এপারের গঙ্গা কি ত্রিবেণী,
রূপনারায়ণ কাঁসাই।

ওপারের খাল বিল, নদীনালা
জনপদ নারকেল ও সুপারি যেমন
এপারের গৈরিক প্রান্তর, গ্রাম, তাল শাল পিয়ালের বন।
উভয় বাংলার শহর ও জনপদ একই ভাষায় কথা বলে,
একই মানবিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনুভূতি, তৃপ্তি চেয়েছি সকলে—
বাঙালী অজেয়, তার মৃত্যু নেই পীড়নে, শাসনে, অত্যাচারে ;
এই কথা উভয় বাংলার আজ আট কোটি কণ্ঠে ওঠে কী স্বত উৎসারে !
পৃথিবীর স্বাধীন দেশেরা তবু কেন যে নির্বাক, বাণীহীন !
মানবিক শুভবুদ্ধি জাগবে না ওদের ?
বলবে না কি এক বাক্যে 'এ-বাংলা স্বাধীন ?'
বাংলাদেশ মৃত্যুঞ্জয়,
দেখবে সে স্বাধীন সূর্যোদয়,
সেদিনের আর দেরি নয়।

শুভেন্দু বসু

মৃত্যুঞ্জয়

জীবনের মৃত্যু হয় যদি শান্তশীলিত
উপায়ে কালক্ষেপ করি, তবে মৃত।
আর যদি জীবন বাঁচাতে বলি 'জয় বাংলা', জয়
প্রাণ যদি যায়, তবু মৃত্যু সে ত' নয়,
তার নাম সংগ্রাম মৃত্যুঞ্জয়!

কৃষ্ণ ধর

আজ জ্বলে ওঠার দিন

আজ কি কবিতা লেখার সময়?
আজ আমাদের আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন
শ্যামল মুখশ্রী বাংলার
ঝলসে গেছে দাবানলে
দাউ দাউ পুড়ছে দ্যাখো মেঘবরণ চুল
শাড়ির আঁচলে আগুন, কুমারীর আত্মহত্যা
জননীর কোলে দ্যাখো মৃত সব সন্তানের দেহ
বেহুলার মতো নারী—স্বামী লখিন্দর
কালসাপে কেটে গেছে অন্ধকার শ্বাপদ রাত্রিতে।

আজ আমাদের চোখের জল গেছে শুকিয়ে
আমাদের মা বোন, ভাই বন্ধু
আমাদের স্মৃতি, ঘর বাড়ি, শৈশব যৌবন
আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভালবাসা রাঙা রাখি
সীমান্ত পেরিয়ে ওই বাংলা দেশে নিহত উৎসবে;
কবিতা লেখার দিনে কবে দেখা হবে?

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বাংলা দেশ

আর এক সূর্য রাত্রির চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে
পূব আকাশে আলোর শিখা ছড়িয়ে দেয় ;

আর এক সূর্য আশ্চর্য প্রভাতে শোনায় জীবনের গান
মুক্তি আনন্দিত কণ্ঠ উচ্চকিত ;

আর এক সূর্য দুরন্ত দুপুর বহে আনে—
দুরন্ত অথচ দুর্মদ,

আর এক সূর্য সন্ধ্যারাগে ছড়িয়ে দেয়
শৃঙ্খলহীন পাখির ঘরে ফেরার বিপুল ইচ্ছেটুকু !

ইন্দ্রনীল

বাংলা দেশের জয়যাত্রা

নিথর আকাশে চাপ চাপ অন্ধকার,
জমাট নিশ্ছিদ্র।
পৃথিবীর বুকে ক্লান্ত দেহ নর-নারীর মিছিল,
ভীত সন্ত্রস্ত পর্যুদস্ত।
আমরা কোথায় চলেছি ?
প্রশ্ন জাগে হতাশ্বাস মানুষের মনে।
অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়ায় পথ,
খুঁজে বের করতে চায় দিশারীকে।
ভাবপ্রবণ তরুণ,
অন্ধকারের নিরেট দেওয়ালে মাথা কুটে রক্ত ঝরায়,
আর্তনাদ ওঠে আকাশ চিরে।

ঘন জমাট অন্ধকারের মধ্যে বয়ে চলে,
শতলক্ষ যুগের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
মিছিলের মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে।
ঝড়ের দিনে মেঘনার ফেনিল জলরাশির মত
ফুঁসে ফেঁপে আক্রোশে ফেটে পড়তে চায়।
বানভাকা পদ্মার ঘোলা জলের মত
প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে,
ভাসিয়ে নিতে চায় সব বাধা, সব বিঘ্ন।
কাল বোশেখীর দিনে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত যমুনার মত,
ফেনিল আবর্তে ডুবিয়ে দিতে চায়
শোষক ও অত্যাচারীর প্রমোদতরী॥
দিন গড়িয়ে হয় মাস, মাস গড়িয়ে বছর।
অশক্ত মানুষ মনে মনে আশার বুদ্‌বুদ্‌
ভাঙে আর গড়ে, গড়ে আর ভাঙে।
চারদিকে অন্ধকার আরও জমাট, আরও ঘনীভূত।
পথ কোথায়? কে দেবে পথের ঠিকানা?
হঠাৎ বুড়িগঙ্গার জলে আলোর ঝিকিমিকি।
একদল কিশোর ও তরুণ মিছিল ভেঙে দাঁড়িয়েছে
আত্মপ্রত্যয়ের শক্ত মাটিতে।
ওদের ঋজু ঋজু দেহ যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী
এক একটা আগুনের গোলা।
ওদের বজ্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে মাতৃভাষার,
দাবি অধিকারের।
মুহূর্তের মধ্যে অত্যাচারীর বুলেট,
ওদের কলিজা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে যায়।
ওরা একে একে লুটিয়ে পড়ে মাতৃভূমির বুকে॥
মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের রক্তে জন্ম নেয় বাংলা দেশ॥
মিছিলের মানুষ পথ খুঁজে পায়,
খুঁজে পায় পথের দিশারীকে।

হতাশ্বাস মানুষের বুকে জাগে আশা,
দুর্বল বাহুতে ফিরে আসে শক্তি।
অত্যাচারীর মনে আতঙ্ক আর ভয়।
বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ
শক্ত পায়ে ঋজু দেহে দাঁড়িয়ে ওঠে।
সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, জয় বাংলা, বাংলার জয়।
পূব দিগন্তে নবোদিত সূর্য।
পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশের জয়যাত্রা।

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশ তোমার মুখ

মনে হলো
যেখানে পা রেখেছি সেখানে মাটি ছিল না কোনওকালে
সুদূর অরণ্য-অতীতের অন্ধকারেও
কখনও কোনও দিন বয়নি বাতাস সুস্মিত ফুলে।
ঘাতকের উদ্যত তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির বীভৎস মুখ
রক্তাক্ত হিংসার অট্টহাসি
আগ্নেয় তৃষিত জিহ্বায় ধূমায়িত উৎসব
দ্বিপ্রাহরিক উৎসর্গের রক্তস্নানে স্বাগত, তবু
আকাঙ্ক্ষিত জীবনের ক্রন্দিত আর্তনাদ
এই সব কিছুতে
এই সব কিছু দিয়েই
উপক্রান্ত তরঙ্গিত আকাশের নীল
পায়ের নীচে
বৈশাখের উষর মরুতে ভাঙাভাঙা সবুজের মিল।
তবু অকস্মাৎ
কখন সম্মুখেতে তুমি—
পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখের শোকেও

মৃত্যুর তুহিন বিস্তারেও
দাঁড়িয়ে আছো
নীল চোখে নিভৃত স্বপ্নের প্রতিবিম্বিত সুধা নিয়ে
আমার জীবন—
আমার ভালোবাসা।

মনে হলো।
আর সব কিছু ছাড়া এখন এখানে শুধু
এই-ই সত্য :
কতো রক্তাক্ত পথ, কতো শূন্যতার অনুভব
কতো হিংসার শাণিত মুখ পেরিয়ে
তবে তোমাতে আমাতে দেখা হলো।

সামসুল হক

বাংলা দেশের নামে

এক চশমার দু'টি কাচের মধ্যে একই
বুকের পুতুল আজন্মকাল কেবল দেখি,
এক চশমার দু'টি কাচের মধ্যিখানে
এক জননী দাঁড়িয়ে আছে অভিমানে।

শুধু প্রেমের এক কবিতা, ভালোবাসা
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে দুই স্তবকে,
একটি সুরের দিন রজনী যাওয়া আসা
গানের মতো ছড়িয়ে থাকা দুই শোলোকে।

সরোজ বেরা

শপথ

ভাখো
যখন 'শপথ নিলাম' উচ্চারণ করেছি
ভেবো
এটা আমাদের বুকের রক্ত দিয়েই লেখা।

এখন তোমার পদ্মা নদীর
কামাল মাঝি জেলেদের হাতে
বৈঠার বদলে বন্দুক
সবুজ রাখালিয়া ছেলেদের হাতে
বাঁশির বদলে অসি
তোমার মেয়েরা তো
তার ভাইদের রক্ষা করবার জন্তে
যমের দুয়োরে
কাঁটা বিছিয়ে দিচ্ছে
নিজেদের রক্তাক্ত সত্তা দিয়ে।
দেখছো না
তাতেই তো রক্তপিপাসু বাঘের হাত
ধূর্ত শেয়াল নেকড়েরা
একে একে
মেঘনার ঘূর্ণি আবর্তে
মৃত্যুর আর্তনাদ নিয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে।

বিশ্বাস করো
এবার আমাদের
তোমার চোখের জল মোছাবার পালা
সমস্ত শিকল ভেঙে
তোমার মুখে সূর্য ফোটাবার
সময় এসে গেছে
তাই
আমরাও বুকের রক্ত দিয়ে
লিখলাম 'শপথ নিলাম'।

সুনীল দাশ

জন্ম যদি বঙ্গে তব

অথচ সেই মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আরো একবার বাজলো। আরো একবার তুমি আমার বুকের গহনে নেমে বললে, সময়ের সংগে পাঞ্জা কিন্তু সব মানুষকেই লড়তে হয়। সেই নিভৃত যুদ্ধের কোন কোন ভীষণ নীরবতায় কখনো বা হঠাৎ ভেসে ওঠে শব্দ, যে শব্দ মা হ'য়ে কথা বলে; বাসমতী চাল ধোয়া ভেজা হাতের ছোঁয়ার মতন কপালে রাখে করতল। শুধু সেখানেই পাশা-পাশি জীবনে ও জীবনায়নে, আজন্ম গর্ভের ঋণ, সেই সুরে কাছে দূরে; কার কণ্ঠস্বর হ'য়ে আমাকেই ডাকে, জন্ম যদি বঙ্গে তব। ভালবাসা অন্য নাম তার।

আমিও তোমার মত প্রতীক্ষায় গড়ে উঠি মাটিতে রেখে হাত।
মাটিই মেটাতে পারে এ রক্তের যা কিছু তফাৎ॥

ভাস্কর বসু

আমরা

আমরা সম্প্রতি এক গুপ্তবীর্যে উন্মত্ত অধীর
সিনেমায় রেস্টুরেন্টে যুক্তফ্রন্ট গড়েছি বিবাদী।
কুমারীর যুবতীর কটাক্ষ প্রেরণা নিয়ে বীর
বিক্রমে লড়াই করি শালীনতা ভদ্রতা ইত্যাদি
প্রাচীন গলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে শতাব্দীর।
হাওড়ায় শিক্ষক খুন, বারাসতে সলিল সমাধি
লক আপে নির্বাণ লাভ হল কটা চরম পন্থীর—
এ সব সংবাদে আমরা দার্শনিক অদ্বৈতবাদী।

অক্ষত পশ্চাত নিয়ে ঘরে ফিরে বিপুল উদ্যমে
শহীদ স্মরণে ডাকি, বন্ধ্ আজ কলবা কি দমদমে।

মালকাবারে উত্তমর্ণ বাজারের গোবর্ধন শাহ্‌!
ইস্তেমে লেকুরি কিংবা মিলিটারি? সর্বদা উধাও!

দিনে মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে বক্তিম কুর্নিশ!
রাত্রে স্বপ্নে চোখে ভাসছে, আহা সেই পদ্মার ইলিশ।

শান্তিময় মুখোপাধ্যায়

এপার সীমান্তে

পদ্মা-মেঘনা বুড়িগঙ্গা-কর্ণফুলীর গর্জনে কান রেখে
আজ কেমন করে গঙ্গার কুলুধ্বনি শুনব?
যদিও এপার বাতাসে একই বারুদ জ্বলা গন্ধ,
যদিও সাড়ে চার কোটি প্রাণে একই অঙ্গীকার
তবুও এপারে রাত পোহাতে এখনো অনেক দেরী
তাই তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী অহঙ্কারই আমার গর্ব।

আজ কলমই আমার রাইফেল,
মন বারুদ, দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী,
তাই এপার সীমান্তে,
কঙ্গো-কিউবা-ভিয়েতনামের অংশীদার
বঙ্গবন্ধু,
জঙ্গী দানবের মুখোমুখি, আমিও তোমার সঙ্গী!

অজিত মিত্র

[পূর্ববঙ্গের পবিত্র গণ-বিপ্লবকে স্মরণ করে]

মহৎ মুক্তির ডাকে

পূবের আকাশ লাল, মেঘনা-পদ্মা সে-আলোয় আসো—
ঘুম ভাঙে চতুর্দিকে ডাক ওঠে, 'জয় বাংলা জয়',
শ্বাপদ সংকুল পথ, কতো রক্ত সে-পথে ঝরলো,
উদ্দীপ্ত পূর্বের দেশ—ইতিহাসে আশ্চর্য বিস্ময়!

নিপীড়িত জনগণ খুঁজে ফেরে মুক্তির অমৃত ;
দানবেরা হানা দেয়, তবু বাধা অতিক্রম করে
এগিয়ে চলে গণশক্তি বুকে তুলে শহীদের শব—
'জয় বাংলা জয় জয়' রব নগরে-বন্দরে।

এ-রব হৃদয় থেকে উৎসারিত তাই বুঝি একে
বারুদের স্তূপ দিয়ে রুদ্ধ করা বড়ো অসম্ভব!
পূবের আকাশে সূর্য অনুরাগে রাঙা হয়ে ওঠে
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে রক্তে গড়া মাটির সৌরভ!

মহৎ মুক্তির ডাকে পূর্ব আজ প্রতিজ্ঞা-কঠিন,
মৃত্যু সে পায়ের ভৃত্য—এনে দেবে সূর্য রাঙা দিন!

মিহির পাল

উজ্জ্বল রোদের মধ্যে ঝকমকে তরবারি

কালো টাকার রমরমা বাজার
মাগ্‌গি ভাতার জন্যে বক্তৃতা মিছিল
আর রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরী, বেওয়ারিশ শব,
পূতিগন্ধ জঞ্জাল দেখতে দেখতে—
কেমন একটা ঝিমুনি মেরুদণ্ডটাকে বাঁকিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ আমার রক্ত দেহের অণুপরমাণু
আর সমগ্র আবিল চৈতন্যের মধ্যে
এক বজ্রপাত বিচ্ছুরিত হল।
তাকিয়ে দেখি—লাখো লাখো সূর্যকণা
পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গা ধলে শরীর দর্পণে
ঝলসাচ্ছে সীতার অগ্নি পরীক্ষার মতো।

আর রাশিয়া চীন ও ভিয়েৎনাম ঘুরে
আমাদের পূর্ব দিগন্ত ছুঁয়ে একটি ফলক
ছুটে এসে আমার বুকে বিঁধল।

একটা বোবা আবেগ সুখ বেদনা মমতা
শ্যামল নদীধৌত ভূভাগ ঘিরে
মুখর হতে চাইছিল।

আমার ভুবড়ে যাওয়া মেরুদণ্ড
আমার নিরক্ত শিরা উপশিরা
আমার ছাতাপড়া পৌরুষ
উজ্জ্বল রোদের মধ্যে
ঝকমকে তরবারি হয়ে ঝুলতে থাকল।

সুনীল বসু
একটি শপথ

তোমরা সব চুপচাপ নির্বিকার বসে আছো
পৃথিবীর মাতব্বর দেশগুলোর রাষ্ট্রপতিরা
এই নির্বিচার গণহত্যার তোমরা নীরব দর্শক
কিন্তু ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করবে না
মনে রেখো!

বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে
আজ বারুদের কটু গন্ধ
বহুদিনের জমানো অসন্তোষে
আজ দাউ দাউ অগ্নিশিখা,
কিন্তু হে রক্তলোলুপ পিশাচের দঙ্গল
তোমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী!

আমাদের রক্তের বিনিময়ে
কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন আর
মুক্তির আন্দোলনে
স্বাধীনতার যে সূর্যোদয় দেখছি
তাকে কেউ রোধ করতে পারে না

তার আলোকে কেউ
অন্ধকারে ঢাকতে পারবে না!

মেশিনগানের গুলী
কামানের গোলা
বিমানের বোমা
তার কাছে সব তুচ্ছ
মাছির, বিষ পিঁপড়ের, বিষাক্ত পতঙ্গের উৎপাতের মত
তার আবির্ভাব
আমাদের সমর্পিত প্রতিটি প্রাণের কড়ায় গণ্ডায়
মূল্য দিতে হবে তোমাদের
প্রতিটি রক্তফোঁটার হিসাব আমরা রেখেছি—
সামনে তোমাদের কঠিন বিচারের দিন
এই রক্তপাত আমরা বৃথা যেতে দেব না
এই নির্বিচারে ধ্বংসের আমরা প্রতিশোধ নেবই।

পৃথিবীর শক্তিমান দেশের
মাতব্বর মোড়লরা
তোমাদের মুখোশ খুলে গিয়েছে
কিন্তু আমরাও তোমাদের চিনে রাখলাম
আমাদের সর্বনাশের দিনে
তোমরা মুখে চাবি এঁটে বসে আছো
দেখছ মরণ-পণ লড়াই
তোমাদের পুতুপুতু নিষ্ফল
আলোচনার চারপেয়ে টেবিলে বসে বসে
দেখছ তোমাদের স্বার্থ কোন দিক ঘেঁসে
তোমাদের লোভের পশুটাকে
সুড়সুড়ি দেয়
তোমাদের হাড়ে হাড়ে আমরা চিনে রাখলাম

আমার সোনার বাংলা দেশে
আজ পিশাচেরা ছিনিমিনি খেলছে

খুনের রক্তে আজ জন্মভূমির মাটি
ভিজে উঠছে
মৃতদেহে আজ স্বর্গকে শ্মশান বানাচ্ছে ওরা
কিন্তু এরও জবাব দিতে হবে
এর হিসাব দিতেই হবে
আমরা মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ নিলাম
ভাইয়ের শব কাঁধে নিয়ে, পাথর চোখে
আমরা শপথ নিলাম

মা, জয় বাংলা আমার মা,
তোমার মুক্তি বিনা
আমাদের আর কেরা নেই
সমস্ত রক্তলোলুপ পিশাচদের
শেষ না করে আমাদের চোখে ঘুম নেই
প্রাণের শেষ স্পন্দন পর্যন্ত আমরা লড়ব
শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমরা যুঝবো
অন্যায়ের দাপটকে
আমরা চুরমার করবই।

অতীন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলা দেশ

ওইখানে বহে চলে নীলাঞ্জন আকাশের নীচে
গৃহস্থ বধুর মত শান্ত এক নদীর কাহিনী—
বুকের হরষে যার ভরে ওঠে সুখের আঙিনা,
জোছনার চন্দনে ঝরে ভাটিয়ালী গানের রাগিনী।

এমন নদীর দেশেও আজ এক ভীষণ দুর্দিন,
অদ্ভুত আঁধারে এক ঢেকে যায় রোদের আসমান,
ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় সুচতুর চক্রান্তের জাল—
বন্ধুর মুখোস খুলে হেসে ওঠে ধূর্ত শয়তান।

সুন্দর স্বপ্নের নদী তাই আজ কল্লোলনাদিনী,
ভাসায় শহর গ্রাম, বিদ্রোহিণী, বিদ্যুতে বন্যায়—
ছুঁড়ে দিয়ে মেকী স্বর্গ সাতকোটি নদীর সন্তান
নূতন মুক্তির মন্ত্রে জেগে ওঠে উদ্দীপ্ত শিখায়।

সংগ্রামে সংগ্রামে আজ বিপ্লাবিত, দৃপ্ত অভিরাম
গরবিণী 'বাংলাদেশ'—সে নদীর অগ্নিদীপ্ত নাম।

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নূতন বাংলা

ওরা থামবে না ওরা চলবে,
ওরা মানবে না ওরা ভাঙবে।

বাংলা ছেলের প্রাণ আবার উঠে জেগে
নদীতে এনেছে বান।
আড়িয়েল খাঁ ইছামতী
উঠছে ফুলে ফুলে,
পদ্মা উঠছে দুলে।
সুপারী-নারকেল বনে
মৃত্যুকে পায়ে দলে
মরছে বাংলা ছেলে।
ওরা থামবে না ওরা চলবে।

শোন্ চেংগিস্ খাঁয়ের দল,
শোন্ রে নাদিরশাহের ভৃত্য সৈন্য সকল;
ফিরবি না তোরা কেউ।
পদ্মার তীরে তীরে
শকুনি—শিয়ালে—
ছিঁড়ে-কুটে খাবে
তোদের মৃতদেহ।

খাঁ সাহেবের দল,
দেখিস্‌নি তোরা—
বোরখা-নারীর শত্রুসংহারি রূপ
টের পাস্‌নি আজো
বঙ্গ-নারী মহিষমর্দিনী
রণে নিষ্ঠুর।
যে আগুন জ্বেলেছিস্ তোরা বাংলা দেশের বুকে
চৈত্রের হাওয়া ছড়িয়ে দিল বাংলা ছেলের বুকে।
মন্ত্র ওদের জয়
মৃত্যুকে নেই ভয়;
মানবে না পরাজয়।
ওরা মানবে না ওরা ভাঙবে।

অচিন্ত্য বসু

রক্ত তিলক

হিংসায় উন্মাদনায়
মাথার ওপর আকাশটা ভাঙে।
নির্লজ্জ দানব হাতে
বারুদ ঝলসে ওঠে।

বারুদ ঝলসে ওঠে
জোনাকি তারার বুক চিরে
আমারই সত্তার মুক্তিমন্ত্র নিয়ে
যশোর খুলনা কিংবা মেঘনা নদীর তীরে।

অরণ্যের মাতামাতি, হাওয়ার হাহাকার—
চট্টগ্রামের বুকে হাঁটে কালকেউটে অসংখ্য,
আমার রক্তে জাগে উষ্ণ শিহরণ,
রাগে ক্ষোভে জীবনের উদগ্রতা

জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায়,
আমার ধমনীতে মৃত্যুঞ্জয়ের উন্মাদনা,
দুহাতের পাঞ্জায়
মৃত্যুনীল সুন্দর-বীভৎসতা,
এ আমার মুক্তি যুদ্ধের পণ,
এ আমার স্বাধীনতার শপথ,
বর্বরতার বুলেটকে ফেরাবোই
আকাশ ছোঁয়া হিংস্র স্পর্ধার বুকে।

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা বোঝে না

স্বাধিকার
প্রতিষ্ঠায় অগণিত মানুষ যখন
নিজেদের সংগ্রামী শোণিতের
নিরত ধারায়
প্লাবিত করেছে পৃথিবীর মুখ

রূপসার নদীচরে যখন এবার
করুণ বেহাগ নয় কাড়ানাকাড়ার
সুরে মন্দ্রিত বাতাস

সমস্ত আকাশে শুধু একটিই ধ্বনি
'জয় বাংলা'
ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হয়।

তখনও সেই বর্বর মূঢ়ের দল বোঝে না
তাদের জীবনের শেষতম রাত্রি
বড় বেশী কাছিয়ে এসেছে।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ললাটে রক্তের তিলক

ইতিহাস,
বুঝি আবার রক্ত শিঙায় ফুৎকার দিলে ?
বাংলা দেশে জ্বলল আগুন
বাতাস কাঁপল কামানের গর্জনে
আর মাটি পড়ল ঢাকা লক্ষ বাঙালীর রক্তের ধারায়।

তেইশ বছরের শৃঙ্খলিত স্বাধীনতা আজ আকাশ দেখেছে
যে আকাশের নতুন পতাকা—
সবুজ জমিন, লাল রঙের মাঝে আঁকা সোনালী বাংলা।
সাত কোটি বাঙালীর আজ শেকল ভাঙার গান—
যে গানের ভাষা 'জয় বাংলা',
সুর—দেশপ্রেম আর আত্মদান।

ইতিহাস,
সাম্রাজ্যবাদীর লোভ, জিঘাংসা আর পাশবিকতা
তুমি তো কখনও ক্ষমা করনি ;
তোমার রথের চাকায় গুঁড়িয়ে গেছে কত সাম্রাজ্য,
কত হিটলার আর মুসলিনী—
ওরা সবাই জিততে চেয়েছিল।

তাই,
ললাটে রক্তের তিলক এঁকে সাত কোটি বাঙালীর প্রতীক্ষা
তো ব্যর্থ হবার নয় :
আগামীকাল—
সূর্য তো উঠবেই।

পূর্ণেন্দু পত্রী

ওদের সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে

আমাদের জন্মের আগে পরে পৃথিবীতে কম বিদ্রোহ-বিপ্লব জন্মায়নি। আমাদের মরা হাড় চলুর রক্তের অবয়বগুলো আচমকা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সেই সব বিদ্রোহ-বিপ্লবের সংবাদে। আমরা আকাশে তুলেছি সমর্থনের হাত অথবা প্রতিবাদের মুঠি।

কিন্তু আমাদের জন্মের পরে পৃথিবীতে এই প্রথম এক প্রবল বিপ্লব যার গৌরবে আমাদের গর্ব ও উল্লাসকে মাপবার কোন দাঁড়িপাল্লা নেই। যেহেতু এই মুক্তিযুদ্ধে যারা সৈনিক, তাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা এক, একাকার। এই প্রথম আমরা শুনলাম, মৃত্যু-পণ-করা একটা দেশের মুক্তি ঘোষণা, যার বর্ণমালা আমাদেরও বর্ণমালা। এই প্রথম মৃত্যু পেরিয়ে, রক্তধারা ডিঙিয়ে, মেশিনগান মাড়িয়ে গোলাবারুদের গর্জন ছাপিয়ে এক বিপ্লবী দেশের প্রিয়তম কবিতা যখন ছুটে এসে আমাদের চেতনাকে আলিঙ্গন করে বলে—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', তখন তাকিয়ে দেখি সেই একই কবিতা একই ভাষায় একই অক্ষরে টাঙানো রয়েছে আমাদেরও মর্মতলে।

আপনারা কবে আসছেন? আমরা স্বাধীন হতে চলেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কুড়ি কি বাইশ দিন আগে কলকাতায় এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল বাংলাদেশের কবি আমিনুল ইসলাম। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল এপারের সহোদরের প্রীতির প্রতীক 'তিন পাপড়ির ফুল'-এর মলাট। যুদ্ধের খবর আসে রোজ! জয়ের সংবাদ। আনন্দে গাজনের বাজনা বাজে বুকের মধ্যে। কিন্তু তারই ফাঁকে মনের আনাচে কানাচে ক্রমাগত কিছু বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা। আমিনুল এখন কোথায়? ছাপাখানায়, না রণক্ষেত্রে? তার কবিতার বই কি বেরিয়েছে? নাকি জল্লাদের হাতে জ্বালানো আগুনের নীচে জ্বলে জ্বলে ক্রমাগত রাঙা হয়ে উঠছে তার কবিতার কালো অক্ষরগুলো?

তাহলে জ্বলুক। কদিন বাদেই সকাল। রোদ উঠলে আবার তো ফুটতে হবে 'তিন পাপড়ির ফুল'কে, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী।

বিজয়কুমার দত্ত

জয় বাংলা

যে দেশে কখনো যাইনি, সেই দেশ আজ
আলোকিত সারা বিশ্বে, বাংলা দেশ এই দীপ্ত মশাল প্রতীকে
অথচ আমারো দেশ, বাংলা—আমি তার
রশ্মিরেখা, মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে
দেখতে পাই—ভাবি কোন মৃত্যুর আঁধার
ভেদ করে যেতে চাই, যেখানে মেঘনা পদ্মা পারাপারে, শুধু
রক্তের অজস্র ঢেউ ওঠে পড়ে বসন্ত সন্ধ্যায়।

গ্রামে গঞ্জে শ্মশানের প্রতিচ্ছবি, চতুর্দিকে সবুজ প্রান্তরে
কবর ভূমির মাটি প্রসারিত। মৃত্যু এত স্বচ্ছন্দ সহজ
মর্মান্তিক আর্তকণ্ঠে, ঘাতকের নিষ্ঠুর আঘাতে।
অথচ জীবন এসে কাঁধে হাত রাখে,
জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে নিঃশ্বাস বাতাসে
উনিশশো একাত্তরে এই মুক্তির দশকে
নতুন জন্মের গুপ্ত মাতৃগর্ভ উন্মোচন করে দিয়ে যায়।

যশোরে-রংপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্বাধীন নির্ঘোষে বাজে মন্ত্রধ্বনি—শুনি কাণ পেতে,
যেখানে ধ্বংসের স্তূপ থেকে আজ ভেসে উঠছে, নতুন বাংলার
ইতিহাস-ভূগোলের সীমারেখা গ্লোবের রেখায়—
এপারে হৃদয়ে বীজ, ওপারে আশ্চর্য অফুরান
ফসলের ঋতুকণ্ঠে, রৌদ্রে আর বাতাসের গান।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশ

ইতিহাসের খুলে দেখো পাতা
মানুষের ভাগ্যের বিধাতা
একই লিপি রচেছেন বারে বারে :
অন্যায় ন্যায়ের অধিকারে
ছলে বলে ও কৌশলে
পায়ে দলে ;
তবু দেখি শেষে
অন্যায় লুণ্ঠিত হয়ে ধূলি সাথে মেশে।

আজি বুঝি সে কাহিনী মরি মরি,
লিখিছে নূতন করি
প্রতিবেশী বাংলা দেশ।
তাই তার অপরূপ বেশ,
নিরস্ত্র হয়েও সবে এক মন এক প্রাণ
শুধু ধর্মবলে হয়ে বলীয়ান্
যুঝিতেছে অন্যায়ের সনে
জীবন-মরণ রণে,
যে অন্যায় শুধু পাশবিক বলে
বাঁধিয়া রাখিতে চায় লোহার শৃঙ্খলে।

হায়, সে যে নাহি জানে
দেওয়ালের লিখনের মানে।
জন্মগত অধিকার
স্বাধীনতা লভিবার
বাংলা দেশের মানুষ করিয়াছে পণ ;
তাই হায় অসাধ্য সাধন !
দুর্জয় সমর শক্তির সাথে

অস্ত্রহীন হাতে
বিক্রমে করিছে রণ,
ঘটিতেছে অসাধ্য সাধন।

যোধা প্রতিবেশী দেখি আর মানি যে বিস্ময়!
বল বাংলা দেশের জয়,
সার্থক করি বীর্য তব
নিপাত হক শত্রু সব,
লিখিত হোক শৌর্যের নূতন ইতিহাস।
সাবাস সাবাস!

সুশীল রায়

বঙ্গদেশ

আহা রে, আহা রে, ওই হাহাকারে কান পাতা দায়—
যে-মাটি যাদের তারা খুঁজে মরে স্বদেশ কোথায়।
তিস্তা-পদ্মা-মেঘনার জলে
স্রোত ভেসে চলে।
এমন বিপুল শক্তি আছে কার, সে স্রোত থামায়।

সমস্ত জাঙাল ভেঙে কেটে-কেটে পথ
ডাঙায়-ডাঙায় চলে জনতার স্রোত।
কর্ণফুলী কত দূর, আরও কত দূরে ধলেশ্বরী
আমরা প্রত্যেকে আজ তারই খোঁজ করি।

আমাদের বুকে জয়ধ্বনি বাজে,
দুরন্ত সংগীত বাজে শিরায়-শিরায়—
যে-মাটি যাদের তারা কেন খুঁজবে স্বদেশ কোথায়!

হে বঙ্গ, তোমার সঙ্গে আমরা সকলে নিপীড়িত,
যাকে বহ্নি বলে, তাকে অগত্যাই সঙ্গী করেছি তো,

সব পাপ পুড়ে যাক, অগ্নির দীপ্তিতে আলোকিত
হোক চতুর্দিক ; দিক্ দীক্ষা সেই অগ্নির মন্ত্রেই
আমাদের একমাত্র অভিপ্রেত এই।
সে-আলোতে, সে দীপ্তশিখায়
খুঁজে পাব অবশ্যই আমাদের স্বদেশ কোথায়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলা

বন্ধ চোখে যাঁকে দেখি
খোলা চোখেও তাঁকে,
দেশ বিদেশে হাত বাড়ালেও
ছুঁই যে বাংলা মাকে।
অনেক ভাষা অনেক ভূষার
নকল আবরণে,
বাংলা থাকে সজাগ হয়ে
দেহে এবং মনে।
ভাগাভাগির পলকা বেড়া
কখন গেছে ধ্বসে,
আসবে ডাক রক্ত দেবার,
রয়েছি তাই বসে।

নিশিনাথ সেন

আড়াল

চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হতো যদি
ভালো হতো ঢের
আমাদের এই হৃদয়ের
নির্জন ছায়ার থেকে হতো না—হতো না—শুনতে আর
স্মৃতির চিৎকার!

চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হতো যদি।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রক্তের স্বাক্ষর

বুকে চের রক্ত আছে। এখন পরম
সঞ্চিক্ষণ, শোণিতে শিরায়
অকরুণ ঢেউ। ছাখো
প্রাত্যহিক পুরণো সংসার
পদ্মদীঘি ধানখেত মেঠোগন্ধে ভরা জন্মভূমি—
এখন আগুনে জ্বলে ছবি।

ডগ্‌রুণ চাপচাপ রক্ত আর
শহীদের শবদেহগুলি
আমার স্নায়ুতে তোলে ঢেউ।
এখন জননী,
অশ্রু নয় প্রচণ্ড ঘৃণায়
আমার চোখের মণি নাচে ;
জননী আমার,
আজ আমি আগ্নের শপথে
বলীয়ান, শত্রু হননের
পবিত্র প্রাণের অঙ্গীকারে
একাকার বাংলাদেশে
লক্ষ লক্ষ শহীদের সাথে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

রোশেনারার স্মৃতিতে

১৯৭১

তোমার ভাণ্ডার থেকে বস্তুগুলি ছিটকে পড়ছে দিকে দিকে
শান্ত কপোতাক্ষ ঐ টালমাটাল
বুড়িগঙ্গা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র আজ অস্থির। আগুন
এখন আমার ঘর, আমি সেই ঘর থেকে যাচ্ছি পায়ে হেঁটে

সাইকেলে অশ্বপৃষ্ঠে যেভাবে যেমনভাবে পারি
আমাকেও যেতে হবে রোশেনারা আগুনের ফুল তুলতে
রক্তে রক্তে হোরিখেলা হবে…
আমার বুকের মধ্যে বাংলাদেশ আমার সর্বাঙ্গে বাংলাদেশ
আমি ঐ কাদামাটি চিনি, জানি কর্মের অঙ্গুলি
যে অঙ্গুলি তাঁতশাল থেকে উঠে এসে টিপেছে ট্রিগার…
মুহূর্তেই সুন্দরবনের ডোরাকাটা হয়ে যায় আমার হৃদয়
যে হৃদয়ে এতকাল ছিল ভাটিয়ালি
রোকেয়া হলের বোন, ভাখো ভাখো নরখাদকের সঙ্গে
সামনাসামনি হাতাহাতি যুদ্ধ করছে হাজার ভাইয়েরা—
তোমরা সবাই আজ দেখিয়েছ মানুষ কী হতে পারে
একদিকে প্রাণের সম্রাট আর অন্যদিকে নিষ্ঠুর পামর
তোমরা সবাই আজ রক্ত ঢেলে পৃথিবীর বুকে ঐ মানচিত্রে এঁকে দিলে
ঐ ঐ বাংলাদেশ অত্যাচারে অপমানে যাকে কেউ কোনদিন
পারে নি গুঁড়িয়ে দিতে মাটির ধুলোয়
আমি ঐ আগুনের শুদ্ধতায় হেঁটে যাবো, আজই রোশেনারা,
যা করবো আজই করবো, আজই ঐ রক্তের নিশানে
বাংলাদেশ হবে বিজয়িনী।

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

বাংলাদেশ : প্রেক্ষাপটে দ্রুত দৃশ্যান্তর

আগুন লেগেছে আজ আগুন আগুন
অগ্নিগর্ভ শ্যাম বাংলাদেশ।
ফুঁসে উঠছে ব্রহ্মপুত্র
পদ্মা মেঘনার বুকে গর্জে উঠছে উন্মাদ গর্জন
কর্ণফুলি বুড়িগঙ্গা আড়িয়াল-খাঁর
স্ফীত জলস্তম্ভে কাঁপছে তরল ইস্পাত।

ধানসিড়ি নদীতীর কাজলা মেয়ে হিজল বাবলা
মধুকুপী ভিজেঘাট ভাটিয়ালি সারেঙের বাঁশিডাকা
চেনা বাংলাদেশ : চলচ্চিত্র—প্রেক্ষাপটে দ্রুত দৃশ্যান্তর।

সুবিস্তীর্ণ বাংলাদেশ—উচ্চকিত বারুদের স্তূপ
বাংলাদেশে প্রতি ঘর—প্রত্যেকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ
বাংলার সাতকোটি প্রাণ—বালবৃদ্ধ গৃহবধূ যুবক-যুবতী—
স্থিরতর প্রতিজ্ঞায় শানিত ইস্পাত :
দস্যুতার কালোহাত উপড়ে ফেলে
নয়া বাংলাদেশ গড়বে প্রতিশ্রুতি তার।

দুর্গাদাস সরকার

বাংলা দেশ

তোমরা বলতে পারো : কোথায় গহর ?
কতো দিন খুঁজছি যে তাকে।
বারবার ডাক দিয়ে যাই :
গহর গহর।
কুলুঙ্গিতে রামায়ণ তোলা
ভাঙা তক্তাতলে পড়ে আছে
কবিতা তোমার।

গহর মরেনি। মরতে পারে না।
সে আজো রয়েছে বেঁচে
বাংলা দেশে বুকের ভিতর ;
হয়তো এখন তার
ডান কাঁধ কামানের গোলায় ঝাঁঝরা,
বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা
তবুও বন্দুক হাতে এক লক্ষ্যে বসে আছে
ট্রেঞ্চের ভিতর।

গহর, আমরা শুধু
অফুরন্ত দিন গুণছি অগুণতি বছর।

এখন আশ্চর্য এই :
মহেশ মরেছে ঠিকই
এক মুঠো ঘাস নেই
বিধ্বংসী বোমায় সব পুড়ে খাক ছাই।
এক আঁজলা পানি নেই,
নিহতের পচা শব ভাসছে পুকুরে।
ট্রিগারে আঙুল কার
পোড়া সুপারির বনে?
ট্রা্‌ট্টাট্‌...ট্রা্‌ট্টাট্‌...
শুনতে পাই সীমান্তের এপারে সবাই।
এখন আশ্চর্য এই :
গফুর ছাড়েনি দেশ,
তৃষ্ণার্ত কন্যাকে পাশে রেখে
ট্রিগারে আঙুল তার।
কারণ এখন তার বাংলা দেশ আপন জননী
পদ্মা-গঙ্গা-দামোদর
রক্তবহ শিরা ও ধমনী।

সীমান্তের শেষ চিহ্নটুকু
আমরাও রক্ত দিয়ে মুছে দিতে নিই অঙ্গীকার
বাংলা দেশ তোমার নামেই এইবার।

রুদ্রেন্দু সরকার

নাজিমা

অদ্ভুত আমার দেশ আমাদের মাটি,
আর ছেঁড়া ফুল শৈশবের স্মৃতি…
কাউকে তখনো বলিনি
বিয়ে আমার হয়েছিল সাতচল্লিশের আগে—
উপেনটি বায়স্কোপ চুলটানা বিবিয়ানার
পর্ব তখন সুরু ;
পরণে কখনো প্যান্ট,
কখনো ছোট্ট পাজামা,
বর আমি আর কনে নাজিমা।

জানি না এখন ওর কটি ছেলে কটি মেয়ে
গড়ে আছে কটি,
নাকি এখনো সেই বন্যাই বয়ে গেছে
চুরি করে আমসত্ত খাবারের কথা ;
নাকি আমারই মতো
ভালোবাসায় ক্ষতবিক্ষত।
কিংবা সংকল্পে অটল বুকে বেঁধে মাইন।

হাইড্রেন্টের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোত,
খেলে গেছে মুহুর্মুহু মিছিলের ধ্বনি,
নাজিমা নিশ্চয়ই শোনেনি
কোনো বাধা কোনো ভয়।
কণ্ঠে তার উচ্চারিত একমাত্র, জানি,
জয় বাংলার জয়।
আমার এ-কল্পনা যেন
বাস্তবে মহীরুহ হয়।

বিমল সেন

অমর ভাটিয়ালি

বন্ধু আকবর আলি
খুলনার খেয়াঘাটে
তোমার উদাস ভাটিয়ালি
এখনও কি শোনা যায় ?
এখনও কি ভৈরব রূপসায়
ভোর রাতে গান গেয়ে
মনসুর দাঁড় বেয়ে যায় ?

যায় না, আমি তা জানি,
আকবর মনসুর আজ
মুক্তি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ সেনানী।
ওদের কণ্ঠে বাজে দীপকের সুর,
মুজাহিদ, আকবর মনসুর।

যুদ্ধ শেষ ; বিজয়ী বাংলায়,
আবার জোছনা রাতে
মনসুর দাঁড় বেয়ে যায়···
খুলনার খেয়াঘাটে
আকবর আলি,
গান গায়···
সুর, ভাটিয়ালি।

আবু আত্তাহার

মৃতদেহের মাঝে আমি

সম্পাদক মশায়,

ক্ষমা করবেন ; মানুষের মৃতদেহের মাঝে বসে
কবিতা লেখার ক্ষমতা আমার নেই
গাঢ় অন্ধকারে লণ্ঠন হাতে আমি মৃতদেহ
দেখে বেড়াচ্ছি এখন
পরিচিত, পরিচিতা, বন্ধু, স্বজন, আত্মীয়দের
মুখ খুঁজছি।
শকুনীরা কিছুক্ষণ আগে পেটভরে মাংস খেয়ে
চলে গেছে
আজ্ঞে হ্যাঁ নরমাংস ! খুবলে খেয়েছে শিশুর চোখ
সুন্দরী সদ্য কিশোরীর মিষ্টি মুখ !
এখন ইতস্ততঃ শেয়াল, কুকুরের ভীড়
দুর্গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক
অত্যাচারের বীভৎস চিত্র দেখে আমি প্রায়
বোবার মতন।
এখানে আমারো মৃতদেহ থাকতে পারতো
এবং আপনারা আমাকে নিয়ে
কাবতা লিখতেন, তাই না!
এ সব ভেবেও আমি কিন্তু চমকে উঠছি না
এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি
মানবতা, শান্তি ধর্ম ভাবৎ শব্দগুলো
শুধু অভিধানে ভীড় বাড়ায়
শয়তানরা চিরকালই হায়েনা, নেকড়ের মতো,
হাজার স্বপ্নকে মুহূর্তে ধুলিসাৎ করতে
হাত কাঁপে না ওদের
এখন আমি তাই ভবিষ্যৎ ভাবি না
কেননা এই সব দেখে এটুকুই মনে হচ্ছে
যে কোন মুহূর্তে মৃতদেহের তালিকায়
আমারো নাম লেখা হয়ে যেতে পারে।

রাজেন্দ্র দেশমুখ্য

রক্ততিলক

মেঘনার মতন চুলে অবিকল অগ্নিময়ী নারী
রোশেনারা ভালবাসে ফুল,
দেখ সে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের পলাশতলায়
বুকে গোঁজা রক্তজবা, চোখে তার প্রাণের বিস্ময়,
গানে তার জয় বাংলা জয়।

কী যে ভয়ংকর দিন ও-বাংলার হৃদয়পর্বতে
চূড়ায় ওঠার আগে রক্তনদী ভাষায় সংসার,
দস্যুর মারক অট্টহাসি,
কখন সর্বাতিক্রান্ত জয়ে উড়বে বাংলার নিশান?
দাসত্বের হবে অবসান!

এসো তবে রোশেনারা, অগ্নিময় নরনারী যত
রক্তসন্ধ্যা এই চৈত্রময়
দীপকে ঝংকার তুলি বাঙালীর শঙ্খের মালায়
কপোতাক্ষী নদীকূলে নববর্ষে নতুন আশায়
মুজিবের জয় বাংলা জয়।

গঙ্গা পদ্মা দুই বোন প্রাণমনে এক জলরেখা,
রক্তের তিলকে জয়লেখা।

জগদীশ ভট্টাচার্য

তোমার বুকের রক্তে

তোমার বুকের রক্তে যে-মাটি বিশুদ্ধ হল আজ
স্বর্গাদপি গরীয়সী
সে-মাটির বুকে
আমিও বাঙালি হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছি একদিন।

বঙ্গভূমি আমার জননী
বাংলা ভাষা আমার মায়ের দেওয়া ভাষা।

তুমি আমি আমরা সবাই
শুধু সাড়ে-সাত কোটি নই,
অতীতের
একালের
অনাগত অনন্তকালের
কোটি কোটি অমর মানুষ।

তোমার বুকের রক্তে যে-মাটি বিশুদ্ধ হল আজ
সে-মাটির বুকে
বীররক্তে বীর্যবান্ হয়ে
জন্ম নেবে মানুষের চিরজীবী প্রাণ—
জন্ম নেবে চিরমুক্ত বাঙালী সন্তান॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙলার এই রূপ

নদীর ওপারে দেশ,
নদীর এপারে দেশ,
মাঝে নদী কান্নার জাহাজ ভাসায়।

কে যায়?…কে তুফানের নদী
পার হ'য়ে যেতে চায়?
ও-দেশ এ-দেশ নয়,
ভুলে কী গেছিস দুষমন।
কান্নার নদী! তোর এ-কী গর্জন।

দিন বদলায়।…
নদীর ওপারে দেশ,
নদীর এপারে দেশ,

মাকে কান্না ?—রবীন্দ্র ঠাকুর
আর কাজী নজরুল।
এ নয় চোখের ভুল,
এপার ওপার মিলে
সোনার বাঙলাদেশ কাঁপে থরোথর :
মুজিবর ! শেখ মুজিবর !
তোমাকে পেলাম, তুমি কান্নার
নদীকেও সাজালে রূপসী—

বাঙলার এই রূপ, এত রূপ,
যত চোখ মেলে দেখি, তত বুক ভরে
আর ভালবাসি, তত ভালবাসি ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিচিত্রশালা

তোমার পূর্বের দেশ বলতে মনে পড়তো
নদীনালা—
এই জল, গেরস্থালি ; অন্য পারে
সুপারিসংকুল
নীলাঞ্জন ছায়া আর মনে-পড়া শান্ত
বনফুল
এইসব নিয়ে ঘর ভরে থাকতো
স্মৃতিচিত্রশালা।
আর আজ ? মনে পড়ে, কিংবা মনে
প্রকৃত পড়ে না
কার রক্তে নদীজল বহে আনে
তিক্ত বনফুল !
স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচা নয়,
আগুন খড়ে না
হৃদয়ে হৃদয়ে আলো, দারুণ সন্ত্রাসে
করো ভুল—
মরো—কিন্তু—মেরে মরো এবং উদ্ধার
করো ঘর
নিশ্চিত রয়েছি পাশে, আমি তোর
জন্ম-সহোদর ॥

তারাপদ রায়

তুমি ডাকছ

রাখাল শিশুর হাতে তুমি তুলে
দিয়েছো তলোয়ার,
তুমি আমার সেই স্বপ্ন, তুমি আমার
বাংলাদেশ
মজা নদীর পাশে পোড়ো ভিটের ভরা
চৈত্রে
এখন সেখান থেকে বারবার তুমি
চীৎকার করে ডাকছো,
খোকন, খোকন
বারবার বুকের মধ্যে গুম গুম করে
উঠছে,
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।
আমার রক্ত, আমার জন্ম, আমার
বাংলাদেশ।

শান্তিকুমার ঘোষ

মহানায়ক

একটি মানুষ যেন পণ ক'রে
আছে সব আছে—দেখালো ভিতরে।

নগর সেজেছে নটিনীর মতো :
একা একটি মানুষ সংগ্রামরত।

গ্রাম থেকে গ্রামে···কুটিরে-কুটিরে,
সাঁকো পার হ'য়ে সে চলেছে ধীরে।

একটি মানুষ শুধু মনোবলে
স্বদেশ ফোটায় রক্তোৎপলে॥

বাসুদেব দেব

বাংলা দেশ ১৯৭১

সিঁদুর গোলানো জলে এলোচুল রুদ্রাণীর ছায়া
পদ্মার প্রমত্ত ঢেউ আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয় নিয়তির মত দীর্ঘ হাত
কেঁপে ওঠে শান্ত গ্রাম
ছিনিয়ে কে আনে বজ্র বিদ্যুতের ফণা ছিনিয়ে কে আনে রাঙা মেঘ
সংসারের মাঝখানে, পিরিচের মত খানখান সবুজ গার্হস্থ্য সুখ
বুকের ওপর জলন্ত ত্রিশূল চায় পূর্ণ অধিকার

ঢাকা বরিশাল চট্টগ্রাম রংপুর মৈমনসিংহ কুষ্টিয়ার মাঠে
ছুটে যায় বারুদের ঘ্রাণ ধারালো চৈত্রের হাওয়া
রোশেনারা, বোন আমার
তোর ঐ যৌবনের ভালোবাসা মাখা
বাংলা দেশ ফুটে আছে রক্তের সায়রে

আমার রূপসী বাংলা সেজেছে দারুণ আজ
তরুণের শোণিতে সুন্দর
সাত কোটি মানুষের রক্তিম বিশ্বাসে
সাত কোটি মানুষের জীবন নিশ্বাস
বাংলা দেশ
বাংলা দেশ
আজ তোরে কিছু নাই অদেয় আমার

বিনোদ বেরা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে

বাংলা দেশে বহুদিন পরে
আবার নির্মল দেশপ্রেম—
চরমার যুদ্ধ রক্তপাত
দেহে মনে গাঢ় জাগরণ !

শিশু বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ
দু'পারের প্রত্যেক বাঙালি
বাংলা দেশ বলতে বুঝি আজ
শেখ মুজিবর রহমান।

না, তিনি দেবতা-সন্ত নন
ধর্মান্ধ কি খেলো দেশপ্রেমী,
বাঙালির আত্মার আত্মীয়
শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক।

'স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচা
ঘৃণ্যতম মৃত্যুর সামিল—'
আবার নতুন করে তিনি
মানুষকে শোনালেন আজ।

জীবনে জীবন যোগ করা
অখণ্ড অম্লান বাসভূমি—
বুকের রক্তের বিনিময়ে
চায় আজ প্রত্যেক বাঙালি।

এ ঘর আবিল আবহাওয়ায়
শেখ মুজিবর রহমান
একাধারে ভাই বন্ধু নেতা
পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক।

সোনার বাংলাকে ধ্বংস করে
যে খল হিংস্রক দস্যুদল
মুক্তি বাহিনীর তেজে তারা
অচিরে মৃত্যুর খাদ্য হবে।

আজ দীপ্ত প্রত্যেক মুজিব—
প্রচণ্ড সাহসে জেগে ওঠা
প্রত্যেকের এক ইচ্ছা আশা
শৌর্যে বীর্যে দারুণ সৈনিক।

এ দৃঢ় জলন্ত দেশপ্রেম
প্রাণ তুচ্ছ করা এ যৌবন
নিষ্ফল হবে না মুজিবর,
রাহুমুক্ত হবে বাংলা দেশ॥

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ইতিহাস কথা বলে বাংলার মাটিতে

ইতিহাস কথা বলে বাংলার মাটিতে।

এ সেই পুরোনো কথা, বহুবার শুনেছি অতীতে
তবু যার মানে
পুরোনো হয়নি আজো কালের বিধানে।

পাশব শক্তির মোহে, গর্বান্ধ সম্রাট, তুমি শুনবে না জানি
সে-অমোঘ বাণী ;
যেহেতু এখন
তোমার মুখোশ-খোলা গৃধ্রাচারী মন
পচা অন্ধকারে গিয়ে
গলিত শবের স্বাদ নিয়ে
পৈশাচিক হিংসা আর লালসার সাথে খেলা করে।

অথচ আমরা আজ বহু দিন পরে
নিপীড়নে বঞ্চনায়
যন্ত্রণায়
জেগে উঠে সূর্যের আহ্বানে
নির্ভুল বুঝেছি এক অগ্নিগর্ভ বেদনার মানে।
দীর্ঘ দিন ধরে
আমাদের রক্তের ভিতরে
যে-আশাকে করেছি লালন
সে যে আজ ধমনী বাঁধন
ছিন্ন করে, রক্তমাখা সূর্য হয়ে জাগে
মুক্তির আনন্দ-অনুরাগে।
তুমি আহম্মক রাজা যতই দু'হাতে
অন্ধকার ঢালো, তবু এ-সূর্যকে পারো না নেবাতে;
কারণ আমরা সেই সূর্যের আহ্বানে
মোহ টুটে
জেগে উঠে
নির্ভুল বুঝেছি আজ অগ্নিগর্ভ বেদনার মানে।

শিপ্রা ঘোষ

রূপসী বাঙলা

আজকের বাঙলা দেশ নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মতো
প্রণয় ভিক্ষুক নয়: প্রত্যাখ্যাত পীড়িত মানুষ
পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে: দুই বাঙলার অন্ধকারে
তীব্র শব্দে ভেঙে পড়ছে সর্বনাশা নাস্তির জগৎ।

মৃত্যু! মৃত্যুর অন্য নাম আছে শব্দের আঘাতে
নিঃশব্দ ঘুমের শান্তি ভাঙে না: আজন্ম মানবিক
মিথ্যার মুখোশ শুধু খুলে যায়: এই বাঙলা দেশে,
মনে হয় ভালোবাসা তাই বুঝি হৃদয়ে ধরেনি।

মনে হয় এই অবিস্মরণীয় অনন্ত আঁধারে
বিবেক অদ্ভুত নয় : সভ্যবদ্ধ দৈনিক হত্যায়,
মানুষ মরে না স্পষ্ট অবিরাম রক্তক্ষরণে ;
কতো অমরতা শিল্প জন্মলগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

কিছুই থাকে না বাকি : অরণ্যশীর্ষে বৃষ্টিপাত
দক্ষ যাদুকরী সুখ : ধ্বনিময় রূপসী বাসনা ;
জলের গভীরে সূর্য পুনর্জন্ম বিকল্প হৃদয়,
বিবর্ণ পাণ্ডুর দুই বাহুলার আদিম আঁধারে
যুদ্ধে ধ্বংসে অত্যাচারে সভ্যতার উলঙ্গ উল্লাসে
সনাতন চিত্রকল্প : রিক্ত নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মানুষ
যুগান্তের দৃশ্যপটে একা জলে : প্রতিরোধহীন
পৃথিবীতে আজও খোঁজে গভীর বিপন্ন ভালোবাসা।

জহরলাল সিন্‌হা

লাল প্রভাত

মুক্তি ফৌজের গরম রক্তে তরল রাত
ঐ দূরে শোন আজানের সুরে, লাল প্রভাত!

ভয় নেই আজ তোরা অমৃত, তোদের জয়
তোদের অস্থি কালের কবরে, হবে না ক্ষয়।
তোদের প্রাণের লাল শপথ, তোদের বল,
ভেঙ্গেছে যুগের তিমির কারায়, কাল শেকল।

মহামৃত্যুর মহাশ্মশান, শহীদ শব,
সতী কাঁধে আজ উন্মাদ শিব, কাল ভৈরব ;
খণ্ডিত দেহ ত্রিশূলে ঘোরায়-মহাপ্রলয়!

তোদের অস্থি হবে যে তীর্থ বিশ্বময়।
নূতন পৃথিবী যুগতর্পণে, মিলাবে হাত
ঐ শোন দূরে আজানের সুরে, লাল প্রভাত।

বিভূতি ভট্টাচার্য

বঙ্গবন্ধু মুজিবর

গুলি ও বোমায়, সঙীন খোঁচায় কত প্রাণ কোরবানী
মুজিবর, ওরা পারেনি করতে স্তব্ধ তোমার বাণী,
বঙ্গবন্ধু তুমি বাঙলায়, সব সেরা প্রিয় নাম,
পূবের সূর্য, জানাই তোমায় সেলাম, বহু সেলাম,
ঈথারে ঈথারে আওয়াজ তোমার দেশে দেশে ভেসে যায়,
পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর মাঠ বন সীমানায়,
কর্ণফুলী ও মধুমতী বেয়ে পার হয়ে কত গ্রাম,
এই শহরের আকাশে বাতাসে ছড়ায় যে অবিরাম।
সূর্য উঠছে, আঁধার পাহাড় আগুনে পড়ছে ধ্বসে,
ভ্যাম্পায়ারের ঘুমপাড়ানিয়া ডানাগুলি গেছে খসে,
শেষ হবে আজ দুঃস্বপ্নের অমাবস্যার রাত,
সাত কোটি প্রাণ দেখবেই ওরা এবার সুপ্রভাত।

নির্মাল্য বর্মণ

বাংলা দেশের মন্ত্র

আল্লা
যে-আকাশ মেঘ দিতো পানি দিতো
শাঙন ধারায় ভরে দিতো
শ্যামল মায়ের রূপ
আজ সে-আকাশ থেকে ঝরছে শুধু রক্ত!

আল্লা
বাংলা দেশের মন্ত্র:
হাতের কাস্তেই মারণাস্ত্র
এবং তাতেই তুলবো ফসল এবার
তাতেই নবান্ন।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

বিনিদ্র

সমস্ত রাত বসে বীর যোদ্ধা
গুলিবিদ্ধ এক বাঙালীর পাশে
তার হাঁ-করা মুখ ফেরানো আমার দিকে—
কোন দিন আমি আসিনি
জীবনের এত কাছে।

জয়ন্ত সাহা

নতুন বিহান

হাওয়ায় বাদাম দিয়ে ভাটিয়ালী সুরে
ছইয়াল ডিঙায় যারা গাঙ পার হতো,
আজ
মেঘনার কালো জলে পদ্মার উত্তাল ঢেউ বুকে
লক্ষ লক্ষ উজানে মানুষ।
আমন ধানের মাঠে কলাইয়ের ক্ষেতে
অঢেল রক্তের স্রোত।
মানুষের মৃতদেহে বেথুনের ঝোপ,
জলা বিল, শিমুল বাগান
এখন আদাড়।

পশ্চিম আকাশ জুড়ে শকুনের ঝাঁক
জটলা পাকায়
ইতিহাস ক্ষমাহীন জানে না পিশাচ
লালসায় ভাগাড়ে তাকায়।

পবিত্র রক্তের সিদ্ধি কোনো দিন ব্যর্থ হয় নাই
লক্ষ লক্ষ উজানে মানুষ
রক্তের বদলে পাবে
নতুন বিহান।

শিবশম্ভু পাল

সূর্যমন্দিরে, বাংলাদেশে

আমি চাই রৌদ্রকণা। তোমার মন্দিরে
সাত কোটি পূজার্থীর বুকভরা জ্যোতির্ময় রৌদ্র নিবেদিত
বিনিময়ে পেতে চায় সূর্যচিহ্ন বৈজয়ন্তীখানি শুচিস্মিত
স্নায়ুর গভীরে।

অথচ আমার নেই প্রার্থনার সবল যোগ্যতা,
ক্রমাগত সহোদর হননে অথবা শুধু হননের চতুর প্রশ্রয়ে
আমার ভেতর থেকে আমি গেছি ক্ষয়ে
শূন্য বেদি, নর্দমায় ভেসে গেছে নিহিত দেবতা।

অথচ জাগালে স্মৃতি, নদীশস্যহাওয়াময় জন্মভূমি, জননী আমার,
জাগালে আনন্দধ্বনি সাত কোটি সন্তানের তোমারই উদ্দেশে
আমার বিনষ্ট রক্তে এনে দিলে ধিক্কারের বেশে
অপহৃত উত্তরাধিকার।

আমার সর্বাঙ্গে দুষ্ট সংক্রামক মর্মরোগ জর্জরিত প্রাণ
তবুও চাইতে পারি রৌদ্রকণা হে সূর্যপ্রতিমা,
আমার কারণে নয়, যাতে চূর্ণ করে দেয় কাপুরুষ নরকের সীমা
আমাকে পেছনে ফেলে আমারই সন্তান॥

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎই দুপুরে

হঠাৎ চৌরঙ্গীর মোড়ে ভাটিয়ালি গেয়ে ওঠে
বৈশাখের নিদাঘ তপনে এক ক্ষ্যাপাটে বাউল।
ট্রাফিক পুলিশ চমকে উঠে চিতপাৎ।
ট্রাম বাস যে যার রোজকার পথ ফেলে রেখে পলাতক।
ময়দানে জনসভা থেমে যায়।
ভিখিরী সহর হঠাৎই গেয়ে ওঠে—
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হে বাংলা অন্তত: একবার তুমি

স্মৃতি বড়ো প্রতারক, রাখবো না কোনো মুগ্ধ কিংবা
নগ্ন স্মৃতির মরকা এইখানে :
বান্ধবপ্রতিম এই একান্ত নিজস্ব অন্ধকারে
হে বাঙলা অন্তত: একবার তুমি নাম ধরে ডাকো!
আমি দৃশ্যে ফিরে যাবো
ফিরে যাবো
অকস্মাৎ প্রিয়পতনের কোনো শব্দ মনে হলে।
মাঝে মাঝে আমাদেরো বুকের ভিতরে কিছু শব্দ করে ওঠে
শব্দ করে বলে ওঠে
এই অনুভবের গভীরে প্রিয়পতনের চেয়ে
এতবড়ো দুঃখ নেই কোনো।

পাথরের বুক থেকে
এক পা
এক পা করে
ঢালুপথে জলধারা
নামুক
নামুক
হে বাঙলা তোমার দুঃখে ভরে নিয়ে বুক
আমরা এগুবো পথ
প্রার্থিত মৌলিক বিষাদে ফিরে যাবো।
অমল বিষাদ জানে আমরা কে কোথায় আছি
বুকের ভূ-ভাগ জুড়ে
আঁকা-বাঁকা সরুপথ
কোথায় গিয়েছে নেমে ঢের
সে শুধু বিষাদ জানে।

বান্ধবপ্রতিম এই একান্ত নিজস্ব অন্ধকারে
হে বাঙলা অন্তত: একবার তুমি নাম ধরে ডাকো
আমি 'মাইন' বুকে বেঁধে নিহিত মৃত্যুর কাছে পৌঁছে যাবো
তোমার পায়ের বেড়ি আমি মুক্ত করে দিয়ে যাবো।

তরুণ সান্যাল

বাংলা বাংলা বাংলা

মুক্তি ছিল হাতের মুঠোয় ফুলের কুঁড়ি
বুকের ওমে ফুটিয়ে তোলা লাল আগুনে
নদীর ঢেউয়ে চমক তোলে রেশমি চুড়ি
আরেক বাংলা আলতা পরছে তপ্ত খুনে

অমনি তারে লক্ষ বাহু উজাড় করে
জীবন দিচ্ছে প্রাণের দুঃখ আঁজলা ভরে

আমার মুখে রং ধরেছে বাংলা দেশের
প্রাণের ভাষা গঙ্গা পদ্মা মুক্ত ধারা
হত্যাকারীর হাত মুচড়ে উঠছে হেসে
স্বাধীন মানুষ এপার দোরে দিচ্ছে নাড়া

এখন শুধু প্রতীক্ষা নয়, শক্ত হাতে
প্রাণের রাখী বাঁধতে চাইছি ভোরাই রাতে
আয় রে জোয়ান, আয় চলে আয় এ গৌরবে

সপ্ত কোটি ঐ বাঙালি উচ্চ শিরে
চার কোটিরই সাক্ষী, এবার মুক্ত হবে
মুগ্ধ মায়ের শ্যামল সোনার অঙ্গ ঘিরে

ভয় কে দেখাও, ভয়হারাদের মুক্তি বাণী—
গঙ্গাধারায় পদ্মা নাচায় বজ্র পাণি।

গৌতম গুহ

সারা আকাশ জুড়ে

সীমান্তে দাঁড়িয়ে
আকাশ মাটির ও শস্যের এক সীমাহীন দেশ দেখে এলাম
—আরতির কালে বিমুগ্ধ বালক যেমন মায়ের পুজো দেখে।
দেখে এলাম, সাড়ে সাত কোটি লোক এক নতুন দেবতাকে অর্ঘ্য দিচ্ছে
নাম তার—'স্বাধীনতা'
কী সুন্দর সে বিগ্রহ !

গোলামের কুর্নিশ নয়, দেখে এলাম
মানবাত্মার লাঞ্ছনা হলে
রক্তের কার্পেটে পা ফেলে কেমন করে রাজার মতো হাঁটতে হয়
শস্যের ক্ষেত পুড়িয়ে দিলে, ক্ষুধার আঁধার রাত্রি ভুলতে হয়
কেমন করে কাড়তে হয়—হারানো স্বদেশ,
লজ্জা ঢাকার একমাত্র বস্ত্রখণ্ড যেন।

বহুদিন চুক্তিহীন যুদ্ধ দেখিনি,
পাইনি শীতার্তের আগুন,
দেখিনি আকাশ জুড়ে কেমন উড়ছে পাখির মতো
সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি ইচ্ছে।

মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মাটি আমার কাছে সোনা

প্রিয়াকেই নয়, কচি-কচি শিশু নয়
নয় শুধু ঈশ্বর-যীশু
তোরা মেরেছিস্ জননী আমার
বারুদে-বুলেটে
বেয়নেটে বিঁধে-বিঁধে ;

আমরা এখন মরীয়া ছেলের দল
বুলেটের মুখে বুক রেখে রুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি
রক্তে-রঙীন রক্ত শপথ আমরা নিয়েছি
আমরা তো জানি স্বদেশ গানের
বুলেট কিংবা মেশিনগানের নয়।

রক্তের কাছে রক্তের ঋণ প্রতিদিন হবে গোনা
বুলেটের সীসা যতই ঝরুক
এ মাটি শ্যামল হবে, এ মাটি আমার কাছে সোনা॥

বরুণ মজুমদার

দুই বাংলা

এপার বাংলা ওপার বাংলা—
দুই বাংলার মানুষ এক, একই ভাষা
দুই বাংলার মাটিতে ফসল ফলে—
একই ফসল, একই ভালবাসা।

এপারে গঙ্গা ওপারে পদ্মা
নেই কোন ভেদাভেদ—
ওদের আল্লা—আমাদের ভগবান;
ওদের কোরাণ—আমাদের সেই বেদ।

ধন চাই না মান চাই না
একটি কথাই চাই—
রাম রহিম আর রমজান
সকলে ভাই-ভাই।

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব-বিবেক ও মুক্তি ফৌজ

রক্ত পিপাসুরা তোমার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত করে,
শহীদদের রক্তে স্নান করে উদ্ভিদদের কম্পন ঘটে।
তবুও মুক্তিকামী মানুষ ভীত নয়
নিরস্ত্র মানুষ ক্ষান্ত নয়,
বজ্রদৃঢ় সংকল্পে তারা বলে
'আজকের এই বীভৎস দিনে
এ অন্ধকার যতই গাঢ় হোক,
এ সংগ্রাম রাত্রির বুক চিরে
সূর্যকে ডেকে আনে।'
ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যার তাণ্ডবলীলায়
নিরস্ত্র মানুষের রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত।
তবুও দুনিয়ার মাতব্বরদের ঘুম ভাঙ্গে না;
তখনও সভ্যতার বুকে চিড় খায় না।
হায় রে আমার সভ্যতা!
হায় রে আমার সংস্কৃতি!
বিশ্ব-বিবেক তুমি কি এখনও জাগিবে না?
তাই বেগম রোশেনারা সভ্যতার মাথায় লাথি মেরে
মেকী সংস্কৃতিকে উপহাস করে
নিজেই জীবন্ত মাইন হয়।
আর সাথে সাথে মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়
"অটল বিশ্বাসে দীপ্ত আমরা
রক্তের অক্ষরে লিখে চলেছি
মুক্তদিনের গান।
বাংলা দেশ আমার বুকের পাঁজরে
ধমনীর উষ্ণ রক্ত প্রবাহে
বাংলা দেশ আমার প্রাণ।"

শচীন দত্ত

জন্মে জন্মে মা

চৈত্র খরায় সবুজ দিনগুলো পাতা ঝরিয়ে পুড়ছে···

আমার চতুর্দিকে মৃত্যুর মহড়া, নৈঃশব্দ্যের হাহাজারি ; ঝোপ-ঝাড়ে
বাদামি রঙের হিংস্রতা চোখের কোটরে সুরে অপেক্ষমান
অন্ধকারের ধূর্ত কালো জানোয়ার—ইয়াহীয় শয়তানেরা
(অস্তিত্বের বিলুপ্তির ইতিহাসে নগ্নতার নির্লজ্জ স্বাক্ষর)। বাতাসে
উড়ন্ত বারুদের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আর প্রেতছায়া আদিম মানুষের
বীভৎস ক্ষুধার্ত চীৎকারে নির্বোধ শিশু, আসন্ন-সম্ভবা ক্রন্দনার
নারীর মৃত্যু পরোয়ানা কাঁপছে।

এবং আমি এই রাত্রির
শ্মশানে ছক কেটে বাঘ-বন্দী ; ধুলোর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দূর
নক্ষত্রের দিকে অন্ধ চোখে তাকিয়ে। কাঠে বাঁধানো আমার পা,
মরচে-পড়া লোহার শিকলের দগ্‌দগে তাজা দাগ আজো
আমার কব্জির খাঁজে খাঁজে।

মাগো, জানি পৃথিবীর মানচিত্রে
অশালীন ধূসর অক্ষরে তোমার নামে জল্লাদের সোচ্চার
বিতৃষ্ণার ইস্তাহার। তবু এই নিষ্ঠুর দিনে, এই ভয়ের রাত্রে
আমার অনুক্ষণের স্বপ্ন-সাধনায় ভেসে ওঠে তোমারই তো মুখ !
ভুলিয়ে দাও তুমি আমার কাঠে বাঁধানো পা ; আমি ফিরে পাই
উলঙ্গ শিশুর সোনালী সুখ, পদ্মা-মেঘনা-ভৈরবের দুরন্ত যৌবন
আমার সব-হারানো ফিঙে-বকুল-তুলসী-মঞ্চ, ফুটন্ত আমের বোলে
বসা গুনগুন বাউল মৌমাছি।

বাংলাদেশ, মাগো, তোমার স্তনে
মুখ রেখে আমি মুহূর্তে হই রোশেনারা, বুক ভরে মৃত্যু
শুষে নিই নির্দ্বিধায়। জানি যে, বারে বারে আসবো ফিরে আমি
তোমারই তো কোলে জন্মে জন্মে—জন্মান্তরে।

রাজলক্ষ্মী দেবী

ধাই-মা

ধাত্রীমাতা, বুক ভরে রক্তের আঘ্রাণ নিও। কোন্ জরায়ুতে
অনায়াসে আজো ফোটে ফুল! কচি শিশুর আয়ুতে
পোকা লাগলেও তার মাতৃস্তন্যে পদ্মা ও মেঘনা
এখনো অঝোরে বয়। ধাত্রীমাতা—তাপ না, সেঁক না,
ভীষণ প্রসবকষ্টে, রক্তস্রাবে তুমি তাকে চেনো
যে তোমার ইচ্ছার শরীর। তুমি বুড়ী সাতকেলে,
শরীর দড়ির মতো। রক্তে আর তরঙ্গ কি খেলে?
আর কি শিশুর সুখ সর্বাঙ্গে বেড়ায়? আর বুকের কলস
ভরে কি দুগ্ধের ধারে? তবে নাও প্রসূতি-পরশ,—
নাড়ী কেটে ধন্য হও,—ছানো, মাখো প্রাণের গৌরব,—
বুক ভরে টেনে নাও আঁতুড়ের প্রামাণ্য সৌরভ।

বিশ্বনাথ মৈত্র

একটি পতাকার জন্ম

পদ্মার ফুঁসে ওঠা বুকের উপর বুক রেখে,
অনেক কান্না শুনে যে-বুকের জন্ম হয়েছিল—
সে-বুকটা এত বড় ভাবতে পারিনি এক
তরুণীর বোরখা-আড়ালে।

তাকে দেখলাম!
রাজপথে—রক্ত, মাংস, হাড় একসাথে
কেমন মিলেছে।

কোথায় রোশেনারা?
ও এখন হাওয়ায় দুলছে—
আর,
জয় বাংলার পতাকা হয়ে গেছে!

হিমাদ্রি রায়

এপার বাংলা ওপার বাংলা

হিম ওড়নায় ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘায় উত্তুঙ্গ পাহাড়ে,—
তোমার শ্যামলী প্রান্তরে,
গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষী
সুবর্ণরেখায় মাগো তোমার একই রূপ
আমি দেখেছি রূপে রূপান্তরে।
শরৎলক্ষীর আগমনী গানে, আনন্দময়ীর বন্দনায়
পীরের দরগায় মানতে, মসজিদের আজানে
আর দেবালয়ের ঘন্টাধ্বনিতে—
বাংলা মায়েরই ধূপছায়া মূর্তি!
মহরমের বুক ফাটানো ঢাকের হাহারবে
আমার প্রাণ বিজয়ার বিচ্ছেদ ব্যথার
সকরুণ রাগিণীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে।
এপার বাংলার বাউল সহজিয়ার গানে
মনের মানুষ খোঁজার আকুল আহ্বানে
ওপার বাংলার ভাটিয়ালি, জারি, সারি গানের
একই উদ্দেশের আর্তি আকুলতায়
আমি উন্মনা বিহ্বল।
কালবৈশাখীর ভৈরব তাণ্ডব
পারাপারের সব সীমা-রেখা
লহমায় পেরিয়ে ঝড়ের কেতন
উড়িয়ে মেঘের নিনাদে
এপার বাংলার আঁধার রজনীতে
আমাকে সচকিত উদ্বেল করেছে
পদ্মাপারের বাঙ্গালী
মানসের মতই
এপারে আষাঢ়ের মেঘকজ্জল দিবসে
বর্ষণ উন্মুখ আকাশের দিকে দিকে

তখন বেজে ওঠে মেঘের দুন্দুভি—
আমার অবচেতনার গহিনে
হারিয়ে যাওয়া ওপারের সর্বপ্লাবী
বর্ষাকে আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে করেছি উপলব্ধি।
শৈশবে হারিয়ে-ফেলা কাশফুল ছাওয়া
রূপসী বাংলার মুখ সোনাঝরানো আশ্বিনে
হেমন্তের পটভূমিতে হঠাৎ কখন ভেসে উঠে
এপারের অন্ধগলির নরকে প্রাণহীন শহরের
সংকীর্ণ বাতায়নে এক চিলতে
সাদা মেঘ-ভাসা
আকাশের ফ্রেমে।
এপারের প্রত্যহের গ্লানি বিরক্তিতে মেশানো
যান্ত্রিক জীবনে—
ট্রামের ঠন্ঠন্ কখনো কোনদিন সচকিত
আমাকে নিয়ে যায় চিরসুন্দর
শীতের তপ্ত মিঠে রোদভরা মেঠো পথে—
শুকনো খালবিলের পাশ দিয়ে
গরুর গাড়ির টুং টুং
শব্দের মন্থর স্বস্তিতে ভরা পৌষালী—
দুপুরের ওপার বাঙ্গলায়।
মাগো আমার রক্তে, মজ্জায়, চেতন, অচেতনতায়
সমগ্র জাগ্রত সত্তায়—সর্বাঙ্গে
প্রতি নিমেষ তোমার এপার
ওপারের—
গঙ্গা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, ধানসিঁড়ির জল,
আর উন্মুক্ত প্রান্তর, স্থলভূমি, গাছগাছালি
আকাশ বাতাস মিলে মিশে অভিন্ন একাকার।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

পূবের বাংলা

যাদুঘরে এলেই দেখবেন
মানচিত্রে ভয়ংকর কাটাকুটি খেলে
রক্তমাখা একটি পেন্সিল দুখণ্ড বাংলার দিকে চেয়ে আছে।
একায়ে পালিত ছিল গাছ।
হঠাৎ বিদায়

দুখণ্ড বাতাস ওড়ে দুই পাড়ে দুইটি শাখায়।
দেহ থেকে খুলে গেল মাটি
কিছু রক্ত কমে যায় ভাগ হয়ে যায় দুটি নয়নের মণি।
ভ্রান্ত পিপাসায়
এই ভাবে ভাঙে ঘট, প্রিয় জল দুধারে গড়ায়।

নীরব সারেঙ
শেষ বিদায়ের বাঁশি বাজায়াছে মন্থর স্টিমারে
শক্তিমান জল
পূবের বাতাস থেকে ঠেলে দিল দূরের পশ্চিমে।
এখন বুঝি না ঠিকমতো
হৃদয়ের কোন্ দিকে গতি?

সম্মুখের পথে হেঁটে চলে যায় সঠিক পশ্চাতে।
এখন বুকের খুব কাছে এলে ঠিক শুনবেন
কে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে ডাকে
সারেঙ্, সারেঙ্।

রত্নেশ্বর হাজরা

বাংলা আমার বাংলাকে

রাজতন্ত্র থেকে মুক্ত স্বৈরতন্ত্র থেকে
গণতন্ত্র থেকেও তোমার
মুক্তি চাই
মুক্তি মুক্তি মুক্তি চাই
অমন শৃঙ্খলা থেকে—

বিশৃঙ্খলা থেকেই তোমাকে
আনতে চাই
এখানে ওখানে ঘরে প্রাণে আন্তরিকতায়
স্থিতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠার ক্রম উত্তরণে
পথে ও পথের প্রান্তে

তোমার উজ্জ্বল মুখ স্পষ্ট অবয়ব
অঘ্রাণের মতো চোখ
গণতন্ত্র থেকে মুক্ত
দেখতে চাই
এখানে ওখানে ঘরে
আমার চারদিকে।

শঙ্খ ঘোষ

দশমী

তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুল তোলা ভোর বেলা যাই
থাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে আসা আলো

যাই উদাসীন দেহে গুরু গুরু বোধনের ধ্বনি
যাই সনাতন বলিদান

কপালে দীঘল ভালো পূজার প্রণাম
যাই মুখ-ঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময়

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধনুচির অন্ধকার

মাঠের কিনারা ঘিরে কেঁপে উঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ বসানো দুঃখ, আর

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

অখণ্ড বাংলা

বারবার চলচ্চিত্র চঞ্চলিত চোখের সামনে
দেখতে পাবার মতো অখণ্ড চিত্রাণী
ভেসে আসা তেমন দেখি না,
অথচ চেয়েছি যেন মনের গভীরতম কোণে—
খণ্ডিত চৈতন্যে নয় অখণ্ড অস্তিত্বে গঙ্গা, পদ্মা বা তিস্তার,
সুন্দর বনের থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে বিপুল বিস্তার।

বাংলার সীমানা জানি একদিকে বিহার বিস্তৃত
অন্যদিকে আসাম ভূভাগ।
অথচ সে ছবি গেল হারিয়ে অতলে যবে অবুঝ সে মন
দ্বিখণ্ডিত একত্র ভূতলে,
এক দেশ দুই ভূমি রাষ্ট্রের গঠনে ;
মনে ভাবে তাই শুধু তাই—
খণ্ডিত চৈতন্য নয় অখণ্ড অস্তিত্বে গঙ্গা, পদ্মা বা তিস্তার,
সুন্দর বনের থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে বিপুল বিস্তার।

প্রাণের প্রীতির সূত্র স্বর্ণরেখা হয়
যখন স্মৃতির তীরে বাংলার প্রকৃতি—
নদী জল মাঠ মাটি ফুল ফল সোনা-ধানক্ষেত,
মানস সঙ্গীব শিখা কর্মের প্রবাহ—
খণ্ডিত চৈতন্যে নয় অখণ্ড অস্তিত্বে গঙ্গা, পদ্মা বা তিস্তার,
সুন্দর বনের থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে বিপুল বিস্তার।
সমগ্র বেদনা আছে বুকের গভীরে।

কি রোগ নির্ণয় হবে? আজকে সমাজে
ঘরছাড়া মানুষের করুণ কান্নায় ভরা জীবনযন্ত্রণা,
প্রতি পদক্ষেপে শুধু অসহ্য বঞ্চনা,
অগণিত জনতার মুখে
ভেসে ওঠে ধ্বনি—
খণ্ডিত চৈতন্যে নয় অখণ্ড অস্তিত্বে গঙ্গা, পদ্মা বা তিস্তার,
সুন্দর বনের থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে বিপুল বিস্তার।

শেখ আলাউদ্দিন

রক্তের শপথ

নির্জন গঞ্জ লোকালয়হীন
নরম মাটির সোনামোড়া দেশ
আজ পচে যাওয়া মৃতদেহের মিছিলে
তাজা রক্ত আর বারুদের গন্ধে বিবাক্ত,
জঙ্গী মেশিনগান আর বোমারু বিমানের
বোমায় বিধ্বস্ত কুষ্টিয়া, ময়মনা, ঢাকা, যশোর
অস্ত্রের প্রতিরোধে অস্ত্র
সাত কোটি হৃদয় দেহের শেষ রক্ত বিন্দুর
শপথে গড়ে তোলে এই শতাব্দীর
সংগ্রামী বাঙালীর ইতিহাস॥

কল্যাণেশ্বর গুপ্ত

সেতুবন্ধন

তোমার আমার মাঝে ফারাক একটি নদী
তোমার দুঃখ, আমার হাসি কিম্বা তোমার হাসি,
আমার দুঃখ ছায়া পড়ে সেই জলে
গ্রহ-সূর্য-নক্ষত্র-তারা উদয়ে হারায় একই সময়ে
ফারাক শুধু মাঝে একটি নদী

ইজ্জতহীন মানুষের মুখোস যখন খোলে
প্রমাণ জঙ্গীশাহীর গোলা আর বারুদে
মুক্তি যুদ্ধে যারা করছে সংগ্রাম
তাদের রক্তে জঙ্গীশাহীর শাসন কাঠি ছিন্ন
আমি শুধু নীরব সাক্ষী

দিনের সূর্য আর রাতের তারারা
বেদনায় হয়েছে সর্বহারা
তার পাশে দাঁড়ায়ে তুমি
নিশান তুলছ মুক্তি
আমি জানাই শুধু সহানুভূতি

প্রভাতের সূর্য এনেছে শুভবার্তা
আর মিছে কেন দেরী করা
চল যাই আমি তুমি নদীতে সেতু বাঁধি
তোমার আমার মাঝে হবে যে
নূতন দিনের মিলন হেতু ॥

প্রফুল্লকুমার দত্ত

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাত

এপার বাংলায় আমি শপথ নিচ্ছি মন্ত্রিত্বের
ওপার বাংলায় তুমি শপথ নিচ্ছো স্বাধীনতার
এপার বাংলায় আমার মাথায় দুঃসহ রাজমুকুট
ওপার বাংলায় তোমার বুকে আন্তরিক আগুন বুলেট

রাজমুকুট মাথায় নিয়েও আমি কাঁদছি তোমার জন্যে
আগুন বুলেট বুকে নিয়েও তুমি হাসছো স্বাধীনতার জন্যে
সহানুভূতির চেয়ে বড় আর কোন অস্ত্র নেই আমার কাছে
তোমার মুক্তি-যুদ্ধে এটুকুই গ্রহণ কোরে আমাকে ধন্য করো।

রাজেন বিশ্বাস

জ্বলছে তারা রোশেনারা

ওপার বাংলা—এপার বাংলা
ওপার-এপার ও কিছু নয়
একই দেশের মানুষ মোরা, দুই গ্রহে ছিটকে পড়া।
ওপার বাংলা—এপার বাংলা
ওপার-এপার কথার কথা
মোদের ভাষা বাংলা ভাষা, মোদের দেশ বাংলা দেশ।

জঙ্গীশাহীর কুকুরগুলো হন্যে হয়ে ঘুরছে ঘরে
তৃষা-মেটায় রক্তপানে নির্বিচারে হত্যা করে।
চেঙ্গীস খাঁ বা নাদীরশাহ জার্মানীর ফ্যাসিস্তেরা
কবর থেকে শিউরে ওঠে, জঙ্গী ফৌজের অত্যাচারে।
বেদনার ওই আকাশ থেকে
লক্ষ শহীদের রক্ত ঝরে।
ওই আকাশেই সত্যরূপে জ্বলছে তারা 'রোশেনারা!'

আনন্দগোপাল মণ্ডল

আঁধার বাংলায় উদিবেই দিনমণি

বিশ্ব যদি পারো শিখে নাও
পৃথিবীর ইতিহাসে একটিই সংগ্রাম
অক্ষয় অমর করে লিখে নাও রক্তাক্ষরে
লিখে নাও মহান জননায়ক বংগবন্ধুর নাম
সেখ মুজিবর রহমান
বংগের সন্তান পৃথিবীর সম্মান।

স্বৈরাচারী লুণ্ঠনকারী বর্বর শয়তান
ঘৃণ্য কলুষ দমন পীড়নে
মুক্তিকামী সাত কোটি সন্তানে আজন্ম
বঞ্চিত করে রেখেছে যারা বোঝেনি তারা
বিশ্বের সম্মান।
দৃপ্ত কণ্ঠে দিকে দিকে ওঠে ধ্বনি
শোনা যায় স্বৈরাচারীর অন্তিম গোঙানী
দুর্ধর্ষ বাঙালীর শোণিতে আজ ক্ষুরাগ্নি উদ্দাম।

সোনার বাংলা স্বাধীন বাংলার সোনার চাঁদ ছেলেদের
চির পদানত রাখবার ভীম প্রয়াস ভাঙো, ব্যর্থ করো।
ছাত্র শিক্ষক নারী ও পুরুষ শ্রমিক কৃষক
দুরন্ত দুঃসাহসী নিঃসংকোচ—
কণ্ঠে তাহাদের প্রতিজ্ঞার বাণী হয় মৃত্যু না হয় মুক্তি
মহান জাতি আমরা বাঙালী।
ভ্রাতৃত্ব আর মাতৃত্বের নিগ্রহ করে
পাবে না তোমরা পরিমাণ
হুঁশিয়ার, রক্তলোলুপ হিংস্র শয়তান!
চেয়ে দেখ!
জঙ্গীতন্ত্রের স্বৈরাচার অনাচার আর অত্যাচারের

মোকাবিলা করতে দুর্ধর্ষ বাঙালী আজ
দৃপ্ত প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন
গণহত্যা নারী লাঞ্ছনায় উন্মত্ত বাসনা—
বর্বর ফৌজী বলাৎকার যাবে ভেসে
বাঙালীর দুরন্ত দুঃসাহসী সংগ্রামে।
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ভেদ করে লক্ষ কোটি কণ্ঠে
ওঠে একটি ধ্বনি—
আমরা বাঙালী
স্বাধীন বাঙলায় উদিবেই দিনমণি।

অভিজিৎ ঘোষ

আহ্বান

বাংলার দুর্জয় শপথের মন্ত্র
রক্তের প্রতিশোধ চাইছে!
স্বাধীনতা-সূর্যের সহস্র রশ্মি
তিমির জয়ের গান গাইছে।

ও পারের আহ্বানে এপারের সহোদর
নিয়ে চলো ভরবারী খড়্গ!
মারণযজ্ঞে আজ শত্রু নিধন করো
প্রাণ মন করো উৎসর্গ।

জাগো তুই বাংলার সংগ্রামী জনতা
আমরা আনবো দেশে শ্রেণীহীন সমতা
রক্তে চোখের জলে নোনা ঘামে গড়বো
মুক্ত স্বাধীন দেশে স্বর্গ!
শত্রুনিধনব্রতে দলে দলে চলো আজ
মন প্রাণ করো উৎসর্গ।

চিত্তরঞ্জন ভৌমিক

ও-পার বাঙলার মুক্তিকামী সৈনিকদের প্রতি

সদর্পে যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো
মুক্তিকামী সেনা দল,
তোমাদের রক্তের লালে
রাঙা হয়ে উড়বে নিশান,
সন্ত্রস্ত হবে ওই জংগীদের প্রাণ!

তোমাদের মুক্তির সংগ্রামে
সমর্থিত, ধর্মঘটী
এ বাঙলায় পাঁচ কোটি প্রাণ।
বিশ্বের দরবারে চির উজ্জ্বল হবে
আকাঙ্ক্ষিত তোমাদের সম্মান।

জ্বালা আর যন্ত্রণার অসহ্য দহনে,
বেদনার অভিঘাতে রক্তের উদ্‌গারে,
অচিরেই জন্ম নেবে মুক্তির ফসল!
অশান্তির আড়ালে আছে শান্তির প্রয়াস,
দহনের মাঝে মুক্ত সৃষ্টি-সম্ভাবনা!
তবে আর ভয় কেন
ক্লান্তি কেন আসে?
লড়ে যাও শেষ রক্ত দিয়ে!

তোমাদের উদ্যত বাহু দিয়ে জানাও
বিশ্বের দরবারে—
সমষ্টি শক্তিতে আজ বাঙলা যেন
অন্য আর এক ভিয়েৎনাম!

আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়

আত্মোৎসর্গের দিন

বাঁচবার প্রার্থনা চিরন্তন বলেই
মৃত্যুকে আমরা বরণ করি, স্বাগত জানাই।
অমৃতের পুত্র যখন
তখন অন্ধকার ও মৃত্যুতে ভয় কি,
ভয় কি জীবনের জটিল যন্ত্রণাকে,
দুঃখকে, ক্ষতকে, রক্তকে!
রক্ত ঝরছেই, ঝরবেই—
ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় আমাদের যাত্রা সুরু
নিরাকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
বারবার বুক দিয়ে ঠেলে আমরা এগিয়ে চলেছি
বেদনায় সমুদ্র উদ্বেল হয়েছে
চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশে
আমাদের মুখের রেখা কঠোর
হাতের মুঠি শক্ত, সংকল্প দুর্জয়
হার মানিনি কখনও, আজও মানবো না।
বাঁচবার প্রার্থনা চিরন্তন বলেই
আজ—আর একবার উৎসর্গ করবো
এই জীবন। এই মৃত্যু যদি
সব কান্নাকে গান করে তোলে
অশ্রুকে হাসিতে,
বুভুক্ষার আস্বাদ আনে অমৃতের
হিমেল রাত্রিকে জানায় উষ্ণ প্রভাতের ইশারা
তবে, তুমিই বল
এ মৃত্যু কি আমার, তোমার সকলের কাম্য নয়?

বিমলকান্তি দাশ

সংগ্রামেরা……

সংগ্রামেরা কখনই ঘুমিয়ে থাকে না
বিস্মৃত জগতে : বই কিংবা পুঁথির
আড়ালে।
সংগ্রামকে জাগাতে হলে
ঋজু কিছু যুক্তি চাই
দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ কল্পনা
এইসব থেকে গেলে
সংগ্রাম হবে সাগরের গভীর
আশ্বাসের মত
থাকবে না শুধু চাপ চাপ রক্তলিখন।
সংগ্রামেরাও প্রাণ পাবে
বাণী কিছু হতে পারে জীবন সত্যের
সংগ্রামকে জাগিয়ে তোল
সংগ্রামের পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে ফেলে দাও
রোদ্দুরে রাত্তিরে গলি থেকে রাজপথে
অগণিত বাঙলার মানুষের মুখে,
সংগ্রামেরা বিদ্যুৎ হোক
ঘর্ষণে-বর্ষণে, খরায় বন্যায় ছেয়ে যাক
ইতিহাসের ভূমিগর্ভ থেকে।

নিত্যানন্দ মণ্ডল

এই চির সত্যের প্রকাশ

কে জানত
গভীর রাতেই হবে রাত্রি শেষ
ঘুটঘুটে কালো আঁধার হবে
লালে লাল, রক্ত গোলাপ

কে জানত
ভিয়েতনামের আগুন
জলে উঠবে ঘরের কোণে
কে জানত
শুনতে পাব 'জয় বাংলা' ডাক
তুমি আমি সবাই সুন্দরবনের বাঘ
ঝাঁপিয়ে পড়ব একদিন মুক্তির নেশায়।
পদ্মা মেঘনার অববাহিকায়
যারা সুন্দর করে এঁকে দেয়
সাহারার আলপনা
কপোতাক্ষ কর্ণফুলীর তীরে
যারা গড়ে তোলে বিষের পাহাড়
তাদের দিন যে ফুরাবে
দিন বদলের পালা একদিন আসবে
এ ছিল স্থির বিশ্বাস।

নির্মল আচার্য
মুজিবর, উদ্যত উত্তর

সহস্র বিদ্যুৎ-ঘোড়ার লাগাম এক মুঠোয় পুরে
কে রুখতে পেরেছে অমিত গতিবেগ তার ?
ইন্দ্রের ঐরাবত ভাসানো বিদ্রোহী স্রোত গঙ্গার
ধূর্জটির মতন আর কে ধারণ করতে পেরেছে মাথায় ?
এ-প্রশ্ন যদি কেউ রাখে,
বিশ্বের উদার দৃষ্টি, অকুণ্ঠ ছন্দ ও ভাষা
সমর্থন জানাবে তোমাকে।
রঘুপতির চরণ পরশে শিলীভূতা অহল্যার মতন
গান্ধীবাদী অভিশপ্ত স্বাধীনতা কার হাতে পেল ত্রাণ ?
অপার হৃৎপিণ্ড-মূল্য আর
পবিত্র তীর্থ-সলিল-রক্তস্নান বিনিময়ে ?

এ-জিজ্ঞাসা যদি কেউ রাখে,
হে বজ্র-পুরুষ!
অকুণ্ঠ জগৎ ঠিক দেখাবে তোমাকে।
যদি কেউ প্রশ্ন করে,
মহান্ রুশ-বিপ্লব দেখেছ কি?
দেখেছ লেনিনে?
ভিয়েৎনামে গিয়েছ কি?
ভিয়েৎকংদের চেন?
দেখেছো মহান্ হোচিমিনে?
আমার উদ্ধত উত্তর হবে,
ভিয়েৎ আমার জন্মভূমি,
ভিয়েৎকংরা আমার ভাই,
এক মাঠ, এক বন, এক ফল-ফুল মরশুমী
বেড়া ঘেরা কোন দিন নাই,
হোচিমিন এবং লেনিন,
মুজিবে হোয়েছে রুদ্র বীণ।
যদি কেউ প্রশ্ন রাখে,
এ-বাংলার ও-বাংলার মধ্যেকার সীসের পাঁচিল
নিষ্ঠুর হাতুড়ি কার করে দেবে ধুলোয় সামিল?
এ-আষাঢ়ে আনবে মৌসুমী?
এ প্রশ্নের উত্তর-ও তুমি।
এ-বাংলার মনে হবে ও-বাংলার মনের অভ্যুদয়।
ও-বাংলার হৃদয়বোধ এ-বাংলা করবে জ্যোতির্ময়,
প্রতিভা-প্রভাব কার ছিঁড়ে দেবে
বিমাতার নাগপাশ-বিষ?
শোষণ বিমুক্ত মাঠ,—সূর্য-শস্য-সোনালী আশীষ?
এ-প্রশ্নের-ও উদ্ধত উত্তর
বঙ্গবন্ধু! তুমি মুজিবর!

মকবুল হোসেন

জয় বাঙলা

বাঙালীর নেতা বাঙলার নেতা মুজিবর রহমান।
মুক্তির উন্মাদনায় আজকে কাঁপছে তোমার প্রাণ।
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই,
জঙ্গী শাসনে মুক্তি চাই,
আজকে তার, হঠাও তোমার কাল্লন ইয়াহিয়া খান্।
জেগেছে বাঙালী ধ্বনিছে কণ্ঠে 'জয় বাংলার' গান।

শহীদের খুন-জোয়ারে এনেছে জঙ্গীর অভিশাপ,
সাত কোটি বীর কণ্ঠে রণিছে মুক্তির ইন্-কেলাব।
জয় বাঙলার মাভৈঃমন্ত্র
ধ্বংস করবে স্বৈরতন্ত্র,
তোমারই সাধনা আনবে সিদ্ধি হানবে মৃত্যুবাণ।
ঘোষিতেছে বীর প্রলয়োঙ্কারে সত্যের অভিযান।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত ব্যথা রুদ্র নির্যাতন,
ক্ষিপ্ত করেছে বাঙলার বুক তিক্ত করেছে মন।
দুর্বার বেগে ভেঙেছে বাঁধ,
সাত কোটি বীর রণোন্মাদ।
হত্যারে তারা পরওয়া করে না চায় প্রাণ দিয়ে ত্রাণ।
বিপ্লবীদের তপ্ত রক্তে বাঙলা বহ্নিমান।

বিদ্রোহী বীর শহীদের খুনে বাঙলার মাটি লাল।
এরই মহাতেজে জন্ম লভেছে বিপ্লবী মহাকাল।
এরই ফুৎকারে বেজেছে তূর্য,
এরই রাঙাপথে উদিবে সূর্য
এরই টীকা ভালে গাইবে বাঙালী 'জয় বাঙলার' গান।
সার্থক হবে বিপ্লবীদের খুনে রাঙা অভিযান।

ফণিভূষণ আচার্য

বাঙলার অপরূপ রূপ

'আমার শ্যামলা রঙের বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়'।

এমন সুন্দর তোকে কখনো দেখিনি
কৃতজ্ঞ রক্তের মতো চৈত্রের খাদায়
মা তোর উঠোন জুড়ে ফুটে আছে উৎসুক মাতাল
'জয় বাংলা' উচ্চারণে প্রান্তরে প্রান্তরে তোর
লক্ষ রায়বায়ান ছুটে যাচ্ছে……
রক্তের সড়কে ছুটছে জয়পত্র শিরে বাঁধা অশ্বমেধে
বেগবান ঘোড়া

বিদেশীর ছাউনিতে কারা তোমরা বসে আছো
ভীরু কাপুরুষ
কামান প্যাটন্ ট্যাঙ্কে তোমাদের কপালে কবর
হানাদারী প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে
ভেঙে পড়ছে ভেঙে…
এ নব-যৌবনে পদ্মা ঢেউয়ে ভাঙে দুর্গের দেয়াল
'জয় বাংলা' মন্ত্র আজ বাজে প্রতি রক্ত-কণিকায়
লক্ষ শিমুলের ফুল হৃৎপিণ্ডের মতো তোর
মাটিতে এমন
মৃত্যুর মোহন রূপ কখনো দেখিনি
এমন সুন্দর তোকে কখনো দেখিনি

মৃণাল বণিক

এপার ওপার

মা গো
কতকাল তোমাকে দেখিনি।
দীর্ঘকাল, দীর্ঘদিন।

এখন কাগজের প্রথম পাতায়
প্রত্যহ তোমার মুখ ভাসে।

মা গো
কতকাল তোমাকে দেখিনি।

এখন
সীমান্তের এপারে আমি
কাঁটাতারে হাত রেখে দেখি
ও পারেতে অসম্ভব ঝড়…।
নকশীকাঁথায় বারুদগন্ধ মাথা।
নিজস্ব করতল টান টান করে
অনায়াসে ক্রত দেখে ফেলি
বিধ্বস্ত জীবনের শিকড় বাকড়…।
তোমার আকাশ বিষের ধোঁয়ায় ঢাকা

মা গো
কতকাল তোমাকে দেখিনি।
দীর্ঘকাল, দীর্ঘদিন।

এখন
হাত বাড়ালেই তোমার আকাশ
পা বাড়ালেই তোমার উঠান
মুখ বাড়ালেই তোমার পরশ
এপার ওপার সব সমান।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন নিয়ে

অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাইশ বছর অপেক্ষায় ছিলাম
বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি
এলো অতর্কিতে।

নীল আকাশ লাল হলো
সবুজ মাঠ লাল
বুকের ভিতর উদ্দীপ্ত আশা,
নিজ বাসভূমি আজ জলন্ত দোজক।
লক্ষ লক্ষ লোকের চীৎকার, হানাদারের উন্মত্ত তাণ্ডব
আমাকে বিরাট দায়িত্ব, পালন করতে হবে।

মন উৎফুল্ল,
অন্ততঃ একটি শিবির ধ্বংস করেছি!
আমার মা কাঁদছে,
হয়তো বা এখনো সময় আছে।
আমাকে এগোতে হবে,
এখনো হয়তো বাঁচানো যাবে
আমার বাইশ বছরের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা।
ধিকি ধিকি আগুনে জলছে বাসভূমি
রঙিন স্বপ্ন টকটকে লাল হয়ে এলো
বুকের পাজরে বুলেট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব
আমার দীর্ঘ বাইশ বছরের সুপ্ত আশা
সফল হবে।

পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

এত অশ্রু, এত রক্তপাত!

রক্তে মাটি লাল হয়
তবু থামে না বিপ্লব···
ছুটে চলে লক্ষ কোটি সন্তানের দল,
মায়ের করুণ কান্না মোছাতেই হবে।
সেই সব লৌহ দানব

যারা আজ ঘটাচ্ছে এত রক্তপাত,
তারা কেউ দীর্ঘস্থায়ী হবে না কখনো।

মা গো, এত রক্ত দেখে
তুমি আর অশ্রু ফেলো না।
কোটি কোটি সন্তান
বুকের রক্ত দিয়ে
এনে দেবে ঠিক তোমার আশ্রয়।

রাখালরঞ্জন ঘোষ

অপরাজিত মন

বাঙলায় লেগেছে আগুন চারিদিকে আজ
নিবিড় রাত্রি শেষে,
চঞ্চলা তাই ভেদিছে আকাশ
প্রলয় দামামা রোষে।
কিন্তু কেন? মানে না মানা
দুর-দুরন্তের বেয়নেটের গঞ্জনা।
করেনি স্বাক্ষর সন্ধিপত্রে দুর্জয় বাঙালী
জানে এর পরিণাম এক ভস্মীভূত জীবন—
এতদিন না বুঝলেও এবার বুঝেছে জয় বাংলা মন্ত্রে
ভেবেছিল এমনি করে চিরদিন
ধর্মবিশ্বাস আর আদর্শের রাংতায় মুড়ে
মানবতা বলে চালিয়ে দিতে পারবে।
কিন্তু সত্যই কি পেরেছে তারা—না,
দুর্জয় মনোবল, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তুষারের
বুক চিরে সূর্যের আলোয়
পথ দেখে দেখে এসেছে
এক নূতন বাণী এক জাতি, একতা।

ভুলিও না ভাই, ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ছুরি
দস্যু দানব করছে লুকোচুরি—
ইতিহাস দেবে সাক্ষ্য অতীতের
জয় বাংলা জয় মুক্তি ফৌজের।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমি ওই ফুলগুলির কাছে যাবো

একা থাকতে পারছি না
একা হলেই রক্তমাখা নিহত ফুলগুলি দুলে ওঠে
অন্ধকার ছিঁড়ে দুলছে ওই আহত নিহত ফুলগুলি
মাটি ঢেকে যাচ্ছে শুকনো ফুলে বীজে
আর ছাখো : মুহূর্তে জলে উঠছে রক্তচাপা শ্মশানচাপা
আর ঘুমুতে পারছি না
ফুলগুলি হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় মুক্তি
কাঁটা তার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ছে বাতাসে
ছিঁড়ে যাচ্ছে পাপড়ি আর
ঝরে পড়ছে রক্তরাঙা ফুলের রেণু
ওখানে কে ? ওই অন্ধকারে কার হিংস্র থাবা ?
ওরা শয়তান, নখে ওদের উদ্যত মৃত্যু
ওরা উপহার দেয় মরণ আর বরণ করে ঘৃণা
ওরা উপহার দেয় মুক্তি আর বরণ করে অভিশাপ

আমি ওই ফুলগুলির কাছে যাবো আর সরিয়ে দেবো অন্ধকার
ঘাতকের মুখে ছুঁড়ে দেবো পাপড়ি আর রেণুর দাহ
ঝলসে যাবে ওদের মুখ ওই রক্তপিপাসুদের ঘৃণ্য দৃষ্টি
দুলে উঠবে হাওয়ায় প্রজ্বলন্ত রক্তচাপা ওই শ্মশানচাপা
আমিও ফুল হয়ে দুলতে থাকবো ওদের পাশে
আমৃত্যু ওই জলন্ত ফুলেদের পাশে আনন্দে।

সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসার কোথায় উত্তর

পূর্ব দিগন্ত লাল—
আগুন অথবা সূর্য,
রক্ত কিংবা আশা বুঝি না এখনও।
জিজ্ঞাসার কোথায় উত্তর—
অযথা বা অর্থময়
শুধু চেয়ে দেখি
শস্যক্ষেতে কুয়াশা,
সোনার ধানের বুকে বিষাক্ত গ্যাসের প্রলোভন
অমৃত না গরল, মৃত্যু নয় প্রাণ,
নব জীবনের গান—
জানি না এখনও
কোথায় লুকোনো সমাধান।
শুধু শুনে যাই
অসংখ্য কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ :
ধ্বংসের পরে সৃষ্টি।
উত্তেজিত আমরা এখন
নীরব দর্শক শুধু
পাই না এখনও ভেবে
মরা নদীর বুকে ও কি
গতির শব্দ না শোষিত রক্ত
বাষ্প হয়ে উঠে

সৃষ্টি করে জলন্ত আকাশ!

অন্নদাশঙ্কর রায়

অনুশোচনা

জননী, তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ
বিকল করেছি অঙ্গ
তোমারে যে ব্যথা দিয়েছি তাহার
শত গুণ বহি, বঙ্গ।
পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর
ছেড়েছি আপন ঘর
দুর্বল ওকে করেছি, হয়েছি
নিজে দুর্বলতর।
জননী, তোমার নিত্য করিব ধ্যান
অভগ্ন অম্লান
তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা
তোমারি তো সন্তান।

পরমানন্দ সরস্বতী

পূব বাংলার ছড়া

১

এক ফুঁয়েতে টিক্কা ফতে, কল্কে হলো খালি
ইয়াহিয়ার আশায় ভাতে মুজিব দিলেন বালি॥

২

তুর্কি নাচে মুর্গি নাচ, ইরাক দেখায় ট্যাংলা,
জঙ্গীশাহী বঙ্গি ভীষণ,—ছিঁড়বে টুটি বাংলা॥

৩

চা-পানি খায় জাপানীরা, চীনারা চাউ-চাউ।
রঙ-তামাশার জ্বলছে আতস, পিণ্ডি বাজায় লাউ।

পূব বাংলায় লাগলো আগুন—এবার হবে কি ?
ইয়াহিয়ার উড়বে খুলি, ভুট্টো খাবেন ঘি ॥

৪

ধিন্‌তা ধিন্ ধিন্,
ঘাড়ে চেপেছে জীন।
(মিঞা) ইয়াহিয়ার
খাঁচায় পোষার
খোয়াব জিন্‌জিন্।
বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর
ফুরিয়ে গেলো দিন ॥

৫

ইয়াহিয়ার অনেক জানা
পুষতে চান বাঘের ছানা
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
ছিল না তার এটুকু জানা।

কেন যে হয় এমন ভুল,
দুঃখে তিনি ছিঁড়েন চুল।
কালীপুজোর বাজনা বাজে
ছিঁড়িস্ নে আর মাথার চুল,
আয় বেঁধে দেই জবাফুল ॥

৬

ইয়াহিয়ার মস্ত লেজুড়,
কলির শনি ভুট্টো ঠাকুর—
বাংলাদেশের খেয়ে কলা,
সুখের ক্ষেতে বাড়ান গলা
কুকুর তাড়া মুগুর দেখে
দৌড়ে পালান বাংলা থেকে ॥

৭

যত আছে ইষ্টি-কুটুম
সবাই হচ্ছে টুম-টুম
মুড়ো গিয়েছে লেজ খসেছে
কেবল আছে ধড়,
চোখ রাঙানি থামা এবার
নইলে হবি কবর ॥

৮

আয়রে আয় পাঠান তুতু
খেতে পাবি বাঘের দুদু—
দুদু খাবি হবি মোটা,
ছিঁড়বে বাঘ প্রাণের বোঁটা।
গুটি কয়েক টিক্কা ফুঁকে,
কালের বাউল নাচবে সুখে ॥

৯

মিঞা এলেন টিয়া মারতে
মেজাজ খানদানী,
অবাক কাণ্ড এ কি!
টিয়ারা খায় মিঞার মাংস
খায় না দানাপানি।
মুক্তিফৌজ করছে আবার
দুষমনী বেইমানী ॥

অমিতাভ চৌধুরী

বাংলাদেশের ছড়া

এক

মুজিব মুজিব কোথায় মুজিব,
মুজিব গেছেন রণে,
ঢাল ধরছেন, হাল ধরছেন
আছেন মনে মনে।

দুই

ঘুমিয়েছিলাম নাক ডাকিয়ে
তেইশ বছর পাক্কা
ঢাকায় আগুন হঠাৎ মারে
কলকাতাকে ধাক্কা
মুজিব দিলেন ডাক
দরজা হলো ফাঁক
পুড়ে মরলো বেরুবাড়ি
ফক্কা ফরাক্কা।

তিন

এ তো বড় জঙ্গী জাদু,
এত বড় জঙ্গী,
চার খুনী দেখাতে পারো
হব তোমার সঙ্গী।
নাদির খুনী চেঙ্গিস খুনী
খুনী বাঘের ভঙ্গী
তারও অধিক খুনী ইয়া-
-হিয়া রণরঙ্গী।

চার

'সেনটো' করে তুকি নাচন
ইরানের বজ্জাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হলো
'সিলোন' ধরে ছাতি।

পাঁচ

টিকা তোলেন হিকা,
এক গুলিতেই কাৎ!
ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া
ঠুঁটো জগন্নাথ।

ছয়

ধা ধিন ধিনা
তবলায় চাটি
হায় হায় জিন্না
সব সাধ মাটি।
পাক-ই-স্তানের
বি-পাক ভীষণ
দেশটা আবার
হয় পারটিশন।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

জয় বাংলার ছড়া

আটুল বাটুল শ্যামলা শাটুল কালো বাদুড়ের ছা
করাচী আর পিণ্ডী ভাবে কোথায় রাখি পা।
ড্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে
বাংলা সাজে নোতুন সাজে
হাটের ঘুম মাঠের ঘুম কোথায় পালালো
গ্রাম শহরে এবার ঘুরে সবাই দাঁড়ালো।

হাড় হয়েছে ভাজা ভাজা মাস হয়েছে দড়ি
সামনে বাড়ো ব্যারিকেডে নোতুন পথ গড়ি।
উল্টো মটাশ পাল্টা পটাশ তাক ধিন ধিন তা
উড়ুং ফুড়ুং লম্বা সুড়ুং ইয়া-ইয়া খাঁ।

উড়ুং ফুড়ুং চামচিকে
পাহারা দেয় চৌদিকে

তার মধ্যে টিক্কা খাঁ পেয়ে গেলেন অক্কা
ট্যাঙ্ক বন্দুক মেসিনগান সবই ক্রমে ফক্কা।
'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা'—আকাশ কেঁপেছে
উজান স্রোতে এপার ওপার দুকূল ভেসেছে।
এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে ভালোবাসা
চোখে আগুন সামনে কদম বুকে বারুদ ঠাসা।
দূরে নয় দূরে নয় ভীষণ কাছাকাছি
তোমার পাশে ব্যারিকেডে আমিও ঠিক আছি

বিশ্বনাথ সান্যাল

পূব বাংলা দেখে

ওপার বাংলায় লড়াই করে
একস্তরে সবাই,
এপার বাংলায় পরস্পরে
মধ্যে চলে জবাই।
ওপার বাংলার নীল আকাশে
নোতুন সূর্য ওঠে—
এপার বাংলার মানুষগুলো
আঁধার পথে ছোটে।
ওদের প্রাণের ছোঁয়া লেগে,
ভাবছি কখন কবে :
এপার ওপার দুই বাংলা
মাতবে মহোৎসবে॥

শৈলেন ঘোষ

এগিয়ে চল

ওরে তোরা এগিয়ে চল্
জয় বাঙলা, জয় বাঙলা বল্
ঝাঁপিয়ে পড়, অস্ত্র নিয়ে
গড় রে তোরা মনোবল।
ভাষা যে জীবন আশা
আ মরি বাংলা ভাষা,
ভাষা তরী, বাওরে মাঝি
চল নাও, পূব বাংলায় চল্।
মোরা সবাই মায়েরই সন্তান
যা রে মাথা শীতল করে
ওই এক আসমান্
তবে মিছে কেন বিভেদ আনিস্
হিন্দুস্থান, পাকিস্থান।
মনের জীবন নিশার স্বপন
সে জীবনে আন্ রে চেতন
হিংসা জলে, জীবন পদে
তোলা রে প্রেমের তুফান।
একই সুরে, কণ্ঠ ভরে
গা সবে পূব বাংলার গান॥

যতীশ ভট্টাচার্য

মৃত্যুর মাঝে মৃত্যু জয়ের····

রক্তাপ্লুত দগ্ধ গলিত বিকৃত—লক্ষ মৃতের স্তূপ,
নগর শহর গ্রাম গঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা
বুড়িগঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-তিস্তা-কর্ণফুলীর জলধারা
'জয় বাংলা'-র শোণিতের রঙে রাঙা।
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যু জয়ের কুলিশকঠিন পণ,—
নয়া জমানার নয়া ইতিহাস
একটি কঠিনকোমল নাম
শেখ মুজিবর রহমান।
শোষিতের ঐক্যে 'ধর্ম' লুকায়েছে মুখ গ্লানির পর্দা টানি
বিভেদ প্রাচীর ভেংগে হল খান্ খান্—
'সোনার বাংলা'—একটি শপথ,
এক করে দিলো হিন্দু-মুসলমান।
গ্রানাইট স্থাপাম কামান
রক্তে তুলেছে বিস্ফোরণের ঝড়,
সাম্রাজ্যবাদীর পাঁজরে জেগেছে মৃত্যুর কম্পন—
অমারাত্রির কালো রঙ মুছে
পুবের আকাশে রক্তের রঙ ফুটে।
অশ্রু আকুল কান্নায় নয়,
শ্বেত, রক্তিম, গোলাপী, হলুদে
লক্ষ সম্ভাবনার উষ্ণরক্তে
'সোনার বাংলা'—সিক্ত:
রক্তের দামে স্বাধীনতা ওরা নিশ্চিত নেবে জিনে
নূতন দিনের নূতন সূর্যের উদয়ের ক্ষণ গুণে।
কত হারিয়েছে, হারাবে যে কত
হিসাব মেলানো ভার—
কান্না দেখিনি চক্ষে ওদের—ইস্পাত দৃঢ় মন
ওপার বাংলা এপারের প্রাণে
ছড়ায় মুঠি মুঠি আলোর কম্পন।

জিয়াদ আলি

সেনানী স্বদেশ হাঁটে

এখন অবশ্য মূল্য ভুল করে জানালার কাছে
শুধু মুখ রাখা নয়, নয় কোনো ভ্রান্তি অপলাপ
এখন আগুন জ্বালা গ্রাম নদী নিকট আবাসে
সম্মোহন ঘোরে চুপ করে থাকা দীনতা ও পাপ।

কেন না চৌদ্দহর বন্দী ট্রেঞ্চে প্রিয় মাতা সহোদর
আমারই অবোধ শিশু বেয়নেট বিদ্ধ হয়ে মরে
রক্তে জলে জলময় বহুতর স্মৃতির কবর
আকাঙ্ক্ষার প্রিয় মুখ তবু সেথা প্রতিরোধ গড়ে।

দুরন্ত ডানায় হাঁটে হারানো যে সেনানী স্বদেশ
তার জন্য জমা রাখা এখন যা কিছু অবশেষ।

তারক ঘোষ

জয়তু মুজিবর

মুজিবর!
নাম নয়, যেন জন্মের পূর্ব মুহূর্ত!
একটা আনন্দ; হোক্ তা যন্ত্রণায় আর্তি,
যে যন্ত্রণা মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি দেয়,
যে বলিদান মানুষকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করে,
যে কুরবাণী মানুষের বাঁচায় শ্রদ্ধা এনে দেয়,
মুজিবর সেই নাম!

যার আহ্বান জড়ত্বে হেনেছে ঘা,
জীবন দিতে তাই কাড়াকাড়ি!
সে-যে ভগীরথ!
যে, স্বাধীনতার গঙ্গাকে আহ্বান করেছে মর্ত্যে
যে, সাত কোটি সগর-সন্তানকে
কপিল-অভিশাপ থেকে বাঁচাবেই।
জয় হোক, তার জয় হোক,
জয় হোক সেই জাগ্রত বাংলার।

মৃণাল চট্টোপাধ্যায়
বর্গীর ছড়া

শ্যামল মাটি শক্ত মানুষ
নদী নালায় আঁকা বাঁকা।
রক্ত তিলক তাদের ভালে
মুক্তি যোদ্ধা শহীদ যারা।
ধানের ক্ষেতে বর্গী হানা
বাহুবলে খেদিয়ে দেব
ঠেঙিয়ে তাদের সাগর পারে,
জন্মে যেন আসে না আর।

এপার ওপার বেড়ার বাধা
কোন বাধাই থাকে না আর।
এঘর থেকে ওঘর যেতে
শেকল যেন বাধে না পায়।
নিজের ঘরে নিজেই রাজা
পোদ্দারী তো সইবে না কেউ।
ছাতা জুতো বগল দাবা
এক নিমেষেই পগার পার।

অখিল সাধু
সূর্যের সমুদ্র শংখে বেজেছে রৌদ্রের ঘণ্টা

এখন বৃষ্টির রাত ধুয়ে ধুয়ে নতুন প্রভাত
সূর্যের সমুদ্র শংখে বহ্নি বলয়
তারকা-খচিত নয়—মুক্ত সবুজ!
ঝড়ের পাখ্‌না কাঁপে মেঘনা মাতাল
পদ্মা রক্ত নদী রূপসী ভীষণ···
প্রলয়ে নতুন দিন অমিত প্রত্যয়ে
প্রবল প্রাণের ঢেউয়ে আগ্নেয় আক্রোশ
ইস্পাতী শপথে মোছে তিমির কুয়াশা;
বলিষ্ঠ সংগ্রামে দেখি মুক্ত স্বদেশ
গরীয়সী বাংলা মা প্রণাম আমার।

এ গণ-গংগায় আজ কি মহাকল্লোল
অনেক রক্ত ঢেলে মুক্তি সকাল
সূর্য বলয়ে গাঁথা আলোর দিগন্তে
নতুন আকাশ দেখি—নতুন পৃথিবী।

অলককুমার চৌধুরী

এপার ওপার : মুজিবর

এপারে :

যখন ঝড়ের রাতে পুরোনো পাতার মত উড়ে আসে

ছিন্নশাখা বালকের একটুকরো জামা

গায়ের ঘামের গন্ধ আঁশটে রক্তের গন্ধে মেশামেশি

নতুন বধুর নিটোল হাতের শাঁখা অত্যধিক সাদা

যেন শুক্লা একাদশী রাত

দুঃখিনী মায়ের একমাত্র হারের লকেট

চুরি যায় রাজপথে নপুংসক ভিড়ে

গৃহস্থের নিকোনো উঠোন থেকে মুছে যায়

সারি সারি লক্ষ্মীর পা।

পৃথিবীর দিন রাত অন্ধকার বিবরে প্রবিষ্ট

চরম নৈরাজ্যে ঘোরে মানবিক চেতনা সমূহ

ওপারে :

তখন মুজিব তুমি পঙ্গু পায়ে বেঁধে দিলে চৈত্রের ঘুঙুর

বাঙলা মায়ের শুরু হোল আরাত্রিক মধ্যরাত্র থেকে

শীতের বিবর ভেঙে প্রকাশিত বাসন্তিক সেনা

রক্তের নৈবেদ্য নিয়ে দুরন্ত বিনীত

শোষিতের হাড়ের কাঠামো—তেইশ মিনার—ভেঙে

এগিয়ে চলেছে

লক্ষ্য কোরে বিশুদ্ধ মাটির ঘর—সোনার বাঙলা—

অপমান ক্ষোভ যাবতীয় নারকীয় অনুভব মুক্ত সেই মুক্তাঞ্চল

কোটি কাঁধ পাশাপাশি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী তুমি মুজিবর

বাঙলার মাঠে ঘাটে নগরে বন্দরে

কোটি প্রাণ ডাকে পরস্পর—জয় বাঙলা—

মাতৃমন্ত্র—অমর সাধক তুমি

এপারের আমাদের রক্তমাখা হাত

মুজিবর

প্রক্ষালিত হবে নাকি পদ্মার সলিলে !

পুত্রহারা

জসীমউদ্দীন

মা

তোমরা কি কেউ দেখেছ আমার সোনার বাছনীটিরে
আমার বুকের আদর যে তার অঙ্গে রয়েছে ঘিরে।
এখনো তাহার অধরে আমার রয়েছে চুমোর চিন,
এখনো তাহার কথায় বাজিছে আমার বুকের বীণ।
কি কারণে যেন মায়েরা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল,
কত পথ আমি রোদনে ভাসানু সে নাহি ফিরিয়া এলো।

পথিক

দেখেছি সে এক সৌম্য মুরতি, বই পুস্তক লয়ে,
আছে মশগুল শতেক শিষ্য পরিবৃত সে হয়ে।
পুঁথির পাতায় তাহার খ্যাতির অশ্ব-মেধের হয়,
দেশ দেশান্তে ঘুরিয়া সদাই বহিয়া আনিছে জয়।
পাতালের বালি আকাশের তারা দুই নখে তার গোনা,
বিশ্ব জগৎ ভরিয়া তাহার সুখ্যাতি-জাল বোনা।
সেই কি তোমার বুকের বাছনী বল অভাগিনী মাতা,
তারি তরে কি গো তব স্নেহ-বুক আকাশে বাতাসে পাতা ?

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, মুখে তার মৃদু হাসি,
গড়ায়ে পড়িছে পথে পথে শত শুভ্র ফুলের রাশি।
এমন তাহার চলন বলন এমন গঠন তার,
আমার বুকের মায়েলী স্নেহের মূরতী সে সুকুমার।

পথিক

তোমার ছেলের মতই দেখেছি, শ্রেষ্ঠী সে একজন,
মণি-মুক্তার পাহাড়ের পরে তাহার সিংহাসন।
দেশের যতেক সুখসম্পদ তাহার মুঠার তলে,
ইচ্ছামতন দেয় কারে কারে অনুগ্রাহিত হলে।

সেই হতে পারে তোমার সে ছেলে, শোন গো দুঃখিনী মাতা,
তারি তরে বুঝি তব স্নেহ-বুক আকাশে বাতাসে পাতা।

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, সৌম্য মুরতি তার,
বিদ্যুদ্দাম জড়াইয়া তারে প্রবন্ধে অনিবার।
যেথায় যে যায় কহন কথায় কত যে কাহিনী গড়ে,
সাধ মেটেনাকো মায়েদের মনে তাহারে আদর করে।
সোনার অঙ্গে রূপের লাবণি জড়ায়ে রয়েছে তার,
বলত পথিক তাহার বিরহ কেমনে সহিছে মার?

পথিক

সেই যে দেখেছি সমর ক্ষেত্রে মহা-সৈনিক সাজে,
দীপ্ত সাহসে অশনি ত্রাশনে যুঝিছে শত্রু মাঝে।
অঙ্গ তাহার শতক্ষতে লেখা খ্যাতির চিহ্নময়,
শত্রু নিধনে লহর গঙ্গা পদতলে তার বয়।
দেশ-দেশান্তে তার জয়-গাথা গাহিছে ভাটের দল,
কীর্তিতে তার এ বোবা মেদিনী হয়ে ওঠে চঞ্চল।
সে হয়ত হতে পারে তব ছেলে, শোন অভাগিনী মাতা,
তারি তবে বুঝি দেশ-দেশান্তে তব স্নেহ-বুক পাতা।

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, সৌম্য মুরতি তার,
যে দেখে তাহারে স্তব হয়ে পথে লুটায় যে অনিবার।
মুখে তার হাসি মধুর মধুর দুঃখ সন্তাপ নাশে,
তারে হেরি হৃদে মমতা কুসুম ফুটিয়া ফুটিয়া হাসে।
এমনি তাহার গঠন গাঠন, এমনি করিয়া চলে,
সহজেই তারে চিনিতে পারিবে কিছু মনোযোগী হলে।
শোন গো পথিক কত দেশে যাও দেখা যদি পাও তার,
কহিও এ বুকে শোকের চুল্লী জ্বলিছে অভাগী মার।

পথিক

হয়ত দেখেছি, সেই একদেশে রুগ্নজনের মাঝে,
মমতা-মুরতি ধরিয়া সে জন রয়েছে সেবার কাজে।

মুমূর্ষু রোগী জ্ঞান ফিরে পেয়ে হেরিছে শিয়রে তার,
কোন ফেরেশতা বসিয়া রয়েছে কত যেন আপনার।
শিরে দেয় হাত অধর মুছায় কহিয়া স্নেহের বাণী,
শুধালে কে তুমি? বলে মৃদুস্বরে ভাই ওরে শুধু ভাই
ভায়ের ব্যথার উপশম লাগি যোগী সাজিয়াছি তাই।
মহামারী আর বসন্ত রোগে ভরেছে সকল দেশ,
সেখানে ফিরিছে ঔষধ লয়ে সেই নয়া দরবেশ।
রুগ্নজনের মুখে দেয় পানি অঙ্গে বুলায় হাত,
আপন বুকের যত স্নেহ আছে মেখে দেয় তারি সাথ।
হেরিয়া তাহারে রোগ যন্ত্রণা রোগীরা ভুলিয়া যায়
যেন তাহাদের অঙ্গ ভরিয়া আদরায় স্নেহ-মায়।
সৌম্য মুরতি অশ্রুসজল পীড়িত জনের দুখে,
আপনার সুখ দেছে বলিদান আনিতে পরের সুখে।
নিজের মৃত্যু মুঠায় লইয়া পরের মৃত্যুসনে
যুঝিয়া চলেছে রোগ-ব্যাধি আর মারীর ভীষণ রণে।

মা

সেই—সেই হবে আমার বাছনী আমার বুকের মায়া,
তাহার জীবনে পেয়েছে আজিকে সেবার মুরতি কায়া।
শোন গো পথিক সেই দেশে তুমি আমারে চল গো লয়ে,
আমি হব তার কাজের দোসর মাতা ছেলে এক হয়ে।*

*কোন বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

হুমায়ুন আজাদ

ব্লাড ব্যাঙ্ক

বাংলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন
প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায়
ব্লাড ব্যাঙ্কে : বাংলার মাটিতে
জমা রাখে ভবিষ্যৎ ভেবে

প্রতিটি শ্রমিক তার চলার কুটিল পথে রাখে রক্তস্বর্ণ বীজ
ইস্কুলের শিশু ছাত্র যুবতী যুবক

গ্রামবাসী চাষী বিক্সাওয়ালা বড়োবড়ো বুদ্ধ ক্যানভাসর
সবাই রক্ত রাখে ব্লাড ব্যাংকে
বাংলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখী।

শুকাতে পারেও পদ্মা, উবে যেতে পারেও সাগর
বাংলার নিসর্গমালা একদিন ঝরে যেতে পারে
তবু এই রক্ত মেখে একদিন
পাবোই নতুন পদ্মা, নিসর্গমালা
উঠে যাওয়া সেই গ্রামটারে।

কে আর রক্ত রাখে ব্লাড ব্যাংকে হাসপাতালে
সেখানে লাল রক্ত ঘোলা হয়ে যায়
কাচ শিশি ওষুধের বিষাক্ত ছোঁয়ায়
বাংলার মাটির মতো ব্লাড ব্যাঙ্ক আর নেই
একবিন্দু লাল রক্ত
দশবিন্দু হয়ে যায় সেই ব্যাংকে রাখার সাথেই
তাই আর যায় না কেউ ব্লাড ব্যাংকে হাসপাতালে
বাংলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখী॥

দিলওয়ার

স্বাধীনতা বলছে

ঐ ছাখো স্বাধীনতা জলছে
স্বাধীনতা : চৈতালী সূর্য ;
বিক্ষুব্ধ আক্রোশে বলছে :
জনগণ ! কই রণতূর্য ?
তুলে নাও তূর্যটা হস্তে,
আজো আমি জালিমের বন্দী,
চোরা মার—উঠতে ও বসতে,
আমাকে জড়িয়ে কত ফন্দি !
স্বাধীনতা শ্রমিকের, জনতার
যারা এই তুনিয়ার ভিত্তি,

স্বাধীনতা মানুষের মমতার—
যে-যার স্বপ্নে দোলে পৃথ্বি।
জনগণ! তোল রণতূর্য,
আর নয় মৌখিক উক্তি
আমি যে ভাঙেছি প্রাণসূর্য,
শেষবার চাই আজ মুক্তি।

মতিউর রহমান

নিজেকে ঘোষণা

আজ আমি নতুন করে ঘোষণা করব
আমার অস্তিত্ব। পৃথিবীর সামনে
দু'হাত তুলে ধরবো।
রক্তজবার মতো হৃদয়। এবং
কতো উল্লাসের মত প্রমত্ত আবেগে
ছিটিয়ে দেবো।
এক মুঠো ফুল।
আকাশ বাতাস এক অপূর্ব
ভাববিহ্বলতায় নিমগ্ন।
পলাশের পাতায় পাতায় জাগে
আশ্চর্য শিহরণ।
চোখ উত্তপ্ত লোহার মত রঙ বদলায়
শিরায় শিরায় ফুটন্ত রক্ত টগবগ
আর
এখন
নিজেকে মনে হয়
ছিটকে পড়া এক টুকরো আগুনের ফুলকি।

আজ
আমি প্রমিথিউসের ডাকের মত

পৃথিবী কাঁদিয়ে আকাশ কাটিয়ে
নিজেকে চমকে দিয়ে
গর্জন করে উঠবো, এগিয়ে যাবো।
সঙিনের আঘাতে
হৃৎপিণ্ডটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গেলেও
একবার পিছনে না তাকিয়ে
এগিয়ে যাবো। এবং
মশালের মত দু'চোখ যদি
দৃষ্টি হারায়—
হারাব।
হৃদয় চুঁইয়ে রক্ত—রক্ত যদি ঝরে
ঝরুক।
তবুও আমি এগিয়ে যাবো।
তাই,
হে সূর্য, উত্তাপ দাও
এবং সঞ্জীবিত করো আমার হৃদয়কে।

শামসুর রহমান

এ যুদ্ধের শেষ নেই

এ যুদ্ধের শেষ নেই। প্রতি পল অনুপল শুধু
গোলাবর্ষণের ধূম্র কুদ্ধ এরোপ্লেনের ছোঁ-মারা
চলে অবিরাম, চূর্ণ ব্রীজ। সাবমেরিন হঠাৎ
ফুটো করে জাহাজের তলা। ট্রেঞ্চ খুঁড়ি প্রাণপণে,
কখনো মাইন পাতি সুকৌশলে একান্ত অকরী
শত্রুকে ঘায়েল করা ছলে বলে। দিগন্ত-ডোবানো
চীৎকারে চমকে উঠি, প্রেতায়িত পড়ে থাকে কতো
মাটি-মগ্ন হেলমেট, শতছিন্ন টিউনিক, হাত।

রাজ্য জয়ের নেশা শিরায় তুমুল নাচে আজো
ঝাঁঝালো জ্যাজের মতো। কিন্তু জানা নেই সে-রাজ্যের

মৌলিক সীমানা। শুধু জানি জীবন ছুটতে হবে,
বিশ্রাম অকল্পনীয়, অসম্ভব রণে ভঙ্গ দেয়া।
কখনো নিঃসঙ্গ ট্রেঞ্চে রসদ ফুরিয়ে আসে, এক
টুকরো সিগারেট ফুঁকি কতো বেলা। শূন্য টিন আর
উজাড় মগের দিকে চেয়ে থাকি সতৃষ্ণ, কাতর।
কখনো জ্বরের ঘোরে দেখি, ওরা আসে উদ্ধারের
প্রবল আশ্বাস নিয়ে—বিশেষণ, বিশেষ্য এবং
ক্রিয়াপদ, আমার আপন সেনা, ওরা আসে ; কিন্তু
তারাই আমার শত্রু, অতর্কিতে করে আক্রমণ,—
ঘামে-ভেজা ক্লান্ত চোখে দোলে জয়, দোলে পরাজয়।

সন্তোষ গুপ্ত

স্বর্গাদপি গরীয়সী বোঝা

কী করে স্বীকার করি অকালের দিনে
তোমার গোলার ধান গোয়ালের গরু
ঘরে ঘরে ভরে দিত তৃপ্তির ভাণ্ডার!
এখনো গোলায় ওঠে ধান, আর ভাখো
ডেয়ারী ফার্মে দুধেলা ধবল গাই
ধনীর প্রাসাদে ঢালে দুধ নবনীত।
সেদিন পুকুর নাকি মাছভরা ছিল,
কণ্ঠে ছিল গান—আজ সব স্বপ্ন কথা?
সেদিনও কি কৃষকের ঘর নবান্নে
চালের গন্ধে ভরে যেত ভুরভুর।

অথচ সুদূর অতীতেও কবি কণ্ঠে
শোনা গেছে দরিদ্রের আকুল প্রার্থনা :
ভিক্ষার এ এক দানা চাল শত দানা
হোক ; শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে তালি দিতে চেয়ে
প্রতিবেশীনীর কাছে দুঃখিনী সূচ যাজ্ঞা
আর তার মনোরথ ব্যর্থ বিলাপের—

সুর আলো শুনি। স্বপ্নের গোচ্ছায় সাথী
দরিদ্র বিলাসী কোন রোমান্টিক মন
যা খুশী বলুক।
অবজ্ঞেয় মূঢ়জন।
আমি জানি স্বর্গাদপি গরীয়সী বোঝা
আমার মায়ের মত তোমাকে স্বদেশ,
ঝড়ে জলে দুর্ভিক্ষ প্লাবনে তোর নিত্য
দায় বহি। আরো জানি বঞ্চনার হাটে
মুক্তি নেই। তবে চোখ থেকে মুছে নাও
নিকানো প্রহর, নামি খরক্রোধ মাঠে।

শফিউল আলম

পরমহংসগণের প্রতি

একা সুবিশাল সরোবরে নক্ষত্রের ছায়ার মতো
কতো প্লাস্টিকের ফুল পুষ্পিত এ বঙ্গদেশে,
ইতল বিতল জল কমলের সোনার স্বাপুর কতো,
রকমারী মুখের আদল মরি হায় স্বাদেশিক লজ্জায়।
আদর্শের বাতাসা ছড়ানো চতুর্দিকে, কথার খই স্বপ্নের
গুড় দিয়ে মাথানো চৌরাস্তায় সিনেমায় বক্তৃতায়, স্ট্রীটে সর্বত্র।

ইদানীং বঙ্গদেশের কিষাণের জোয়াল খেত পুড়ে যাওয়ার
মনোরম ড্রইংরুমে ঝুলে আছে একটা ষাঁড়ের ছবি
শিল্পীর আঁকা, কী তেজিয়ান, কী অভিনব গো-প্রীতি।
একমুঠো কাঁচা ধানের শীষ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে,
তারা বঙ্গদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে ব্যালকনিতে, পিঠাঘরে
বৈশাখী পূজায়, রবীন্দ্র বাণিজ্যে।
ফাগুনের শোকের ফুল তাদের চোখেও ফোটে
তারা অভয় আশ্রমের চাদর মেখে পাঞ্জাবীতে হাঁটু ঢেকে
রাশভারী চালে মঞ্চে দাঁড়ান কেশে —
এ ফাগুনে বুদ্ধিজীবিদের দারুণ চড়া বাজার
পাখা বদলের, রকম করার সময় লাগে অল্প
বাবুদের মতো। আহা মায়ের অঞ্চল নিধি যতোসব।

হে পরমহংসবৃন্দ, সরোবরে জল নেই আর
এবার সাঁতার কাটতে হবে আগুনের সাগরে
কেননা, বঙ্গদেশ এক গণগণে আগুনের হ্রদ।

শহীদুল্লা কায়সার

শহীদের মাকে

যে ছেলে তোমার
গানের পাগল
কেমন করে রুখবে তাকে
ঘরে দিয়ে আগল ?

মা আমার !
তুমি কি জান না
গানের পথে তোমার ছেলে
কোন বন্ধন মানে না ?

সেদিন দুপুরে
তুফান উঠেছিল সুরের নদীতে
তোমার যত ছেলেতে মেয়েতে
গান ধরেছিলাম
আমরা সবাই
আমাদের ছিল বহু কণ্ঠ একটি গান
অনেক বোল অনেক সুর একটি তান।

আমাদের গানে সূর্য হেসেছিল
আমাদের গানে আলোর শিশুরা ধরায় নেমেছিল
পথের ধুলোরা নূপুর হয়ে পায়ে পায়ে বেজেছিল
আমাদের গানে সুরের নদীতে তুফান জেগেছিল
সেদিন দুপুরে।

সহসা সুরের নদীটা
রক্তের বন্যায় ভেসে গেল
সহসা দেখা গেল
গানগুলো আমাদের
পাখী হয়ে উড়ে গেল।

মা, তোমার ছেলে এখন
গানের পাখী।
গানের পাখীর সুরে
এ নদীতে আবার তুফান জাগবে
তুমি শুনবে তুমি দেখবে
যেদিন তোমার ছেলে
তোমার কোলে ফিরে আসবে।

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাত ফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কী সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে।

পাহাড়তলীর মরণচূড়ায়
ঝাঁপ দিলো যে অগ্নি
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরল তারই ভগ্নী।

প্রভাত ফেরী প্রভাত ফেরী

আমায় নেবে সঙ্গে

বাংলা আমার বচন, আমি

জন্মেছি এই বঙ্গে।

সুফিয়া কামাল

মোদের বাংলা ভাষা

মোদের দেশের সরল মানুষ

কামার কুমার জেলে চাষা

তাদের তরে সহজ হবে

মোদের ভাষা বাংলা ভাষা।

বিদেশ হতে বিজাতীয়

নানান কথার ছড়াছড়ি

আর কতকাল দেশের মানুষ

থাকবে বল সহ্য করি।

যারা আছেন সামনে আজও

গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা

আমার দেশের সব মানুষের

এই বেদন বুঝুন তারা।

ভাষার তরে প্রাণ দিল যে

কত মায়ের কোলের ছেলে

তাদের রক্ত পিছল পথে

এবার যেন মুক্তি মেলে।

সহজ সরল বাংলা ভাষা

সব মানুষের মিটাক আশা।

জিয়া হায়দার

বঙ্গভাষী আমরা

বুঝি পূর্ব বাংলার আকাশে এখন সারাদিন
ছবি লেখে উজ্জ্বল রোদ্দুর আর বিপুল শান্ততা ;
এবং সাদাটে মেঘ ছেঁড়া-ছেঁড়া কাপাসের মতো
একটু বাতাসেই কেঁপে কেঁপে উঠে ছড়ায় ছিটোয়
এদিকে ওদিকে ; ভরা যৌবনের শরীরের লাবণ্যিও যেন
হার মানে এমনই নদীর নৃত্য ছলকে দেয় শুভ্র কাশবন,
পলিমাটি চমকে ওঠে কেবল নতুন প্রেমেপড়া
কোন কিশোরীর মত ; সাত রঙা ফড়িঙেরা বুঝি
ঘাস ফুলে বিশ্রামের ছল খোঁজে, এবং কিষাণ
বুকজলে ডুবিয়ে নিজেকে কচি ধানের চারাটা
আরো শক্ত করে এঁটে দেয়, কিংবা আগাছার মূল
তোলে ; বুঝি হিন্দুপাড়া দেবতার থানে
পুজোর উল্লাস চলে ভাড়া করা রেকর্ডে মাইকে ;
এক গাঁয়ের বউ ভরা গাঙে পানি নিতে এসে
দূরের নৌকোর দিকে চেয়ে চেয়ে নাইওরের
কথা বুঝি ভাবে ।

এবং কজন আমরা বঙ্গভাষী, এইখানে আলোহা
টাওয়ারে
দাঁড়িয়ে সমুদ্র বক্ষে শৌখিন ইয়াচ্ আর স্পীড বোট দেখে
রঙিলা নায়ের মাঝি গানটি কেবলি
বেতাল বেসুর লয়ে গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হই, আর
স্মৃতি মমতার সুখে বাঁচাই সত্তাকে ।

আবদুর রাজ্জাক নিজামী

বাংলা ভাষা

আমার ভাষা তোমার ভাষা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা
আমার আশা তোমার আশা সবার আশা বাংলা ভাষা !
এই ভাষাতেই কাঁদি হাসি
এই ভাষাতেই ভালোবাসি
ভালবাসার বাবো মাসী
গন্ধে গানে কাব্যকলায়
ফুটিয়ে তুলি রাশি রাশি !

এই ভাষাতেই আশার কলি পুষ্প হয়ে উঠছে ফুটে
এই ভাষাতেই সুরের দোলায় পদ্মা নদী চলছে ছুটে—
এই ভাষাতেই জনম মোদের এই ভাষাতেই মুছবো আঁখি
এই ভাষাতেই মিষ্টি বোলে গান গেয়ে যায় বনের পাখী
এই ভাষারই মিষ্টি বোলে আমার মায়ের কাঁদা হাসা
আমার ভাষা তোমার ভাষা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা ॥

হাসান হাফিজুর রহমান

অস্ত্র আমার

নিসর্গের কণ্ঠজোড়া বর্ণদর্পী টাইয়ের মতো
অজস্র উড়ছে ঘুড়ি
সারা দেশে একটিও মার্কিন পতাকা নেই,
অনাহত বাতাসের বিশুদ্ধ চলাচলে,
শিশুদের তাজা মুখ যেন ভোরের নিটোল ফুল
ঘরে ঘরে অপাপ বাগানের কথাবলা ছায়া
অপার হর্ম্যরাজি নিরেট ঔদ্ধত্যে আর ঠেকায় না কাউকেই দূরে

ফুটপাতে ফুটপাতে কথকতা, রাজপথে ভাই ভাই হেঁটে চলে
কিংবা দৌড়য় দ্রুত বাসে বা ডবল ডেকারে,
গ্রামকে টেনে নেয় শহর, শহরের কোলে ব'সে গ্রাম
তোলে অভিমান,
আদিগন্ত সারি সারি পথের বাতির আবাহনে সন্ধ্যা নামে,
বাসাহারানোর ভয় ভুলে যায় পাখি।
ধূসর আকাশজোড়া আবিরের স্বরক্ষনা হাস্যময় পাড়।

দূরবিলাসী তির্যক চোখ হেনে
বিদ্রূপের বেড়িবাঁধ কাটিয়ে চৌচির
তক্ষুনি খিল খিল পড়বে লুটিয়ে তুমি
তাচ্ছিল্যের ঝঞ্ঝা হয়ে :
এমন অভাবিত দৃশ্য তুমি কোথায় পেলে ?
কোন্ দিবাস্বপ্ন এমন অলীক স্বর্গ
দিল হাতে তুলে ?   স্বেচ্ছায় বুঝি বা
প্রত্যুত্তরে আমার কথার দামে তোমাকে মহার্ঘ
করবে না আর।   বরং ছাখো চেয়ে, নিজেরই স্নায়ুর কম্পনে
জেনে নাও ভবিতব্য অদূর অনিবার্য।   ছাখো
আজন্ম লালিত ধ্যানের প্রাসাদে তোমার ধরেছে ফাটল।
স্বপ্ন নয়—এক বিপরীত সত্য আজ ধূলিতে ধূলিতে কথা বলে।

তবুও বাঁকিয়ে ঘাড় অবিশ্বাসে তুরুপের শেষ তাস
ছুঁড়বে তুমি পরিত্রাণের সুখী হাঁপ ছেড়ে :
অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায় ?

মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
ছাখো না লক্ষ কোটি তীব্র চোখ তির্য আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাদের আকাশবাতাস চেরে ?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ,
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা।

—